Vol. 32 | No. 1 | 1988

Check for updates

সাহিত্য পত্রিকা

journal.bangla.du.ac.bd

প্রেমধর্ম ও সূফীবাদ

Volume	32
Issue	1
Year	1988
ISSN	0558-1583
eISSN	3006-886X
Author(s)	কাজী দীন মুহম্মদ
Published online	October 1, 1988
DOI	10.62328/sp.v32i1.2
Link to article	https://doi.org/10.62328/sp.v32i1.2
Pages	40-72
Publisher	University of Dhaka
Copyright	সাহিত্য পত্রিকা
Designed and Developed by	Zobayer Abdullah

Check for updates

প্রেমধর্ম ও সূফীবাদ

কাজী দীন মুহম্মদ

এক

উপনিষদের নিরীশ্বর ব্রহ্মবাদ থেকে গীতায় যে ঈশ্বরবাদ ও ভক্তিধর্মের সূচনা হয়েছে, ভাগবতে তারই পরিসমাপ্তি আমরা লক্ষ্য করি। ভাবগত রচনার উদ্দেশ্য ছিল বিভিন্ন রূপক ও গল্পাদির মাধ্যমে হিন্দুধর্মের প্রতিপাদ্য বিষয়গুলোর মধ্যে জ্ঞান ও ভক্তিযোগের শ্রেষ্ঠত্ব সাধারণজনের কাছে বিবৃত করা।

আমরা যাকে ভারতীয় ধর্ম ও সংস্কৃতি বলি, তার ভেতর বৈদিক ও ঔপনিষদিক সংস্কৃতি, পৌরাণিক সংস্কৃতি ও তান্ত্রিক সংস্কৃতির ধারা ত্রিবেণীসঙ্গমের মতো অবিরোধে মিলিত হয়েছে। ভারতীয় ধর্মসাধনার ক্রমবিকাশের ইতিহাস আলোচনা করতে গেলে কেবল উপনিষদ, ভাগবদ-গীতা ও বেদান্ত—এ প্রধান এয়ীর আলোচনাই যথেষ্ট নয়; পুরাণ ও তন্ত্র-সমূহের আলোচনাও অপরিহার্য। বিশেষতঃ অষ্টাদশ পুরাণ অক্ষয় জ্ঞানের ভাণ্ডার, ভগবান বেদব্যাস এ পুরাণসমূহে নানা কাহিনীর ভেতর দিয়ে একদিকে যেমন নানা ঐতিহাসিক তথ্য বিবৃত করেছেন, তেমনি অন্যদিকে ভারতের বিচিত্র ধর্মসাধনার সম্পর্কেও বিস্তারিত আলোকপাত করেছেন। বস্তুতঃ পুরাণসমূহ ভারতের সাধনা ও সংস্কৃতির, ধ্যান ও ধারণার ইতিহাস। এই পুরাণসমূহের মধ্যে শ্রীমদ্ভাগবত ভাষার ঐশ্বর্যে, ছন্দের বৈচিত্র্যে ও কবিত্বসম্পদে, গভীর দার্শনিকতায় ও রসতত্ত্বের বিশ্লেষণে একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে রয়েছে। স্বয়ং শ্রীমন্মহা প্রভু বলেছেন, শ্রীমদ্ভাগবতই বেদান্তদর্শনের অকৃত্রিম ভাষ্য। গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণের মতে 'অচিন্ত্যভেদাভেদই' শ্রীমদ্ভাগবতের প্রতিপাদ্য। ভক্তিশাস্ত্রে বলা হয়েছে, ভগবান শ্রীকৃষ্ণের নাম ও লীলা-সংকীর্তন ও লীলাশ্রবণ ভক্তিলাভের উপায়। শ্রীমদ্ভাগবতের দশম স্কন্ধে উত্তম শ্লোকের গুণানুশীলন ও তার ঐশ্বর্য ও মাধুর্য লীলার কথা

বর্ণিত হয়েছে। ভগবান অজ অর্থাৎ জন্ম-রহিত। এতদসত্ত্বেও তিনি ভক্তের প্রতি অনুগ্রহ বশবর্তী হয়ে এবং ধর্মসংস্থাপনের জন্য নররূপে লীলা করেছেন। আর এ লীলার প্রয়োজনেই যোগ মায়া দ্বারা আপন স্বরূপ আচ্ছাদন করেছেন। ভগবান অখিল রসামৃত সিন্ধু। শ্রীদাম-সুদাম-বসুদাম তাঁকে সখ্যভাবে, নন্দ-যশোদা তাঁকে বাৎসল্যভাবে আর গোপী-গণ তাঁকে মধুরভাবে ভজনা করেছেন। গৌড়ীয় বৈষ্ণবদের মতে মধুর-ভাবে শ্রীভগবানের ভজনা করাই শ্রেষ্ঠ ভজনা। বিষ্ণুপুরাণ, হরিবংশ, শ্রীমদ্ভাগবত ও ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণে এ মধুর রতির চরম উৎকর্ষ বর্ণিত হয়েছে। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে, ব্রহ্ম বৈবর্ত পুরাণেই প্রথম শ্রীমতী রাধার নামের স্পষ্ট উল্লেখ দেখা যায়। এ পুরাণ মতে শ্রীমতী রাধিকা শ্রীকৃষ্ণের স্বকীয়া অর্থাৎ বিবাহিতা পত্নী। দুধ ও তার তরলতা, অগ্নি ও তার দাহিকা শক্তি যেমন অভিন্ন, শ্রীকৃষ্ণ এবং শ্রীমতী রাধা তেমনি অভিন্ন। শ্রীকৃষ্ণের পরকীয়া প্রেম অপর বিধা। বৈষ্ণব প্রেমলীলা সমুদ্রের বহুবিধ তরঙ্গমালার স্বরূপে বিশ্লিষ্ট। পাশ্চাত্য পণ্ডিতদের মতে পৌরাণিক কহিনীর বীজ বৈদিক সাহিত্যে থাকলেও পুরাণসমূহ পরবর্তী-কালের রচিত। কিন্তু অধিকাংশ ভারতীয় পণ্ডিতের মতে বৈদিক ধর্মের সহিত পৌরাণিক ধর্মের কোন বিরোধ নেই। শাশ্বত অনাদি অনন্ত জ্ঞান-রাশিই বেদ; আর বেদের যা প্রতিপাদ্য তা-ই পুরাণসমূহে নানা কাহিনীর মাধ্যমে বিবৃত হয়েছে। আর সে কারণেই পুরাণসমূহ বেদের মর্যাদা পেয়েছে।

আরো একটি কথা। অষ্টাদশ পুরানের মধ্যে ১. ব্রহ্মপুরাণ, ২. পদ্মপুরান, ৩.. বিষ্ণুপুরাণ, ৪. বায়ুপুরাণ, ৫. শ্রীমদ্ভাগবত, ৬. ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণ, ৭. স্কন্ধ পুরাণ, ৮. বামন পুরাণ, ৯. কূর্মপুরাণ —এ নয়খানি পুরাণে ভগবান বাসুদেবের চরিতকথা পাওয়া যায়। এ-সব পুরাণের মেধ্যে শ্রীমদ্ভাবগত নানা কারণে স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যে মণ্ডিত ও এ দেশে সমাদৃত। বলা হয়ে থাকে বেদব্যাস বা ব্যাসদেব পুরাণ-সমূহের রচয়িতা। বস্তুতঃ ব্যাসদেব কোন ব্যক্তিবিশেষের নাম নয়। প্রকৃত প্রস্তাবে শঙ্করাচার্য যেমন তেমনি ব্যাসদেব একজন Generic। মহাভারতের রচয়িতা কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাস ; তাছাড়া ব্রহ্মসূত্রের রচয়িতা পাতঞ্জল দর্শনের ভাষ্যকার, অষ্টাদশ পুরাণ ও অষ্টাদশ উপপুরাণের প্রণেতা সবাই ব্যাস নামে পরিচিত ছিলেন। আর যে-মহর্ষি বেদের

অর্থকে বিস্তৃত করেছেন, তিনিই বেদব্যাস নামে অভিহিত হয়েছেন। কিন্তু আমাদের দেশের ভক্তমণ্ডলীর বিশ্বাস যে, ব্যাসদেব নামক একজন মহর্ষিই বহু শাস্ত্রের রচয়িতা এবং শ্রীমদ্ভাগবত তাঁর শেষ রচনা। এ-বৃহৎ গ্রন্থে তিনি ভাগবত ধর্মের মাহাত্ম্য ও শ্রীভগবানের লীলা বর্ণনা করে শান্তিলাভ করেন। আমাদের মনে হয়, 'বিশ্বাসে মিলয়ে কৃষ্ণ, তর্কে বহুদূর'—ভক্তের এ-দৃষ্টিভঙ্গি থেকে বিচার করলে উপরোক্ত বিশ্বাসকে একেবারে অমূলক বলে মনে করার কোন কারণ থাকে না।

শ্রীমদ্ভাগবত গীতায় শ্রীভগবান অর্জুনকে কর্মযোগ, জ্ঞানযোগ, ধ্যানযোগ ও ভক্তিযোগের উপদেশ দিয়েছেন। ভগবদ্ গীতার ভাষ্য-কারদের বিভিন্ন জন এতে বিভিন্ন যোগের প্রাধান্য লক্ষ্য করেছেন। কিন্তু নিরপেক্ষ দৃষ্টি নিয়ে দেখলে একথাই প্রমাণিত হবে যে, ভগবদ্ গীতায় শ্রীভগবান বিভিন্ন যোগের মধ্যে সমন্বয় সাধন করে ভক্তিযোগের প্রাধান্যকেই ঊর্ধ্বে তুলে ধরেছেন। গীতার শেষকথা স্মরণাগতি, মা মেকং শরণং ব্রজ। আবার যেমন গীতায় ভগবান অর্জুনের মাধ্যমে বিশ্বমানবকে কল্যাণের পথ দেখিয়েছেন, তেমনি শ্রীমদ্ভাগবতে তিরো-ভাবের পূর্বে জিজ্ঞাসু উদ্ধবকে উপলক্ষ করে সমগ্র সৃষ্টির শ্রেয়ের পথ নির্দেশ করেছেন। অর্জুন শ্রীকৃষ্ণের শরণাগত হয়ে বলেছিলেন, 'শিষ্য স্তেহহং শাধি মাং ত্বাং প্রপন্নম—আমি তোমার শিষ্য, তোমার শরণাগত। তুমি আমায় শিক্ষা দাও।' তাই তিনি গুরুরূপে অর্জুনকে শিক্ষা দিয়েছিলেন। অপরদিকে উদ্ধব ছিলেন অর্জুনের চেয়েও উচ্চতর মার্গের জ্ঞান, বুদ্ধি, বিচার ও ধ্যানের অধিকারী। তাই দেখি ভগবদ্ গীতায় যা আছে, শ্রীকৃষ্ণ উদ্ধব সংবাদে সে সবতো আছেই, অধিকন্তু গীতায় যা নেই; সে রসের সাধনার কথাও এখানে অনেকখানি স্থান জুড়ে আছে।

গীতায় ৯/২৭ শ্লোকে শ্রীভগবান অর্জুনকে বলেছেন:

যৎ করোষি যদ শ্নাসি যজ্জুহোষি দদাসি যৎ।
যৎ তপস্যসি কৌন্তেয় তৎ কুরুষ মদর্পণম্॥

"শ্রীভগবানের শরণাগতি এবং সকল কর্মের ফল তাঁর চরণে সমর্পণ"—এ-ই গীতার চরম কথা; আর এখান থেকেই রসসাধনার আরম্ভ। শ্রীমদ্ভাগবতে এই রসসাধনার চরমোৎকর্ষ দেখানো হয়েছে। তাই নিঃসন্দেহে বলা যায়, গীতার যেখানে পরিসমাপ্তি, শ্রীমদ্ভাগবতের সেখানে আরম্ভ।

শ্রীমদ্ভাগবত বলে, জ্ঞানীর নিকট যিনি ব্রহ্ম, যোগীর নিকট যিনি পরমাত্মা, ভক্তের নিকট তিনি ভগবান। যিনি অদ্বয় জ্ঞান ও ব্রহ্ম, পরমাত্মা ও ভগবান—এ ত্রিবিধ শব্দে কথিত হন, তত্ত্ববিদগণ তাকেই তত্ত্ব বলে আখ্যায়িত করেন। জ্ঞানীর নিকট তাঁর চেয়ে বৃহত্তর কিছু নেই বা হতে পারে না, তাই তিনি ভূমা বা ব্রহ্ম। তিনি নির্গুণ নিরাকার বিভু বা সর্বব্যাপী, বাক্য তাঁকে প্রকাশ করতে পারে না অর্থাৎ তিনি অনির্বচনীয়; মন তাঁকে মনন বা ধারণা করতে পারে না; অর্থাৎ তিনি আবাঙ্‌মানসগোচর। তাই তৈত্তরীয় উপনিষদে বলা হয়েছে: যতো বাঁচো নিবর্তন্তে অপ্রাপ্য-মননাসহ ॥ (২।৪) একথারই প্রতিধ্বনি শুনি 'কেন' উপনিষদে : নতত্র চক্ষুর্গচ্ছতি ন বাগ গচ্ছতি নো মনঃ ॥ (১।২) তিনি যে বাক্যের চক্ষুর ও মনের উপলব্ধির ও ঊর্ধ্বে একথা কেবল-মাত্র যোগীই জানেন। তিনি তো পরমাত্মারূপে সবার হৃদয়ে অবস্থান করেন এবং সবার জীবন নিয়ন্ত্রিত করেন। গীতায় বলা হয়েছে:

ঈশ্বর সর্বভূতানাং হৃদ্দেশেহর্জুন তিষ্ঠতি।
ভ্রাময়ণ সর্বভূতানি যন্ত্রারূঢ়ানি মায়য়া ॥

অর্থাৎ 'হে অর্জুন, ঈশ্বর সর্বভূতের হৃদয়ে অবস্থান করেই তাদের যন্ত্রারূঢ় পুত্তলিকাবৎ ভ্রমণ করাচ্ছেন।' কিন্তু আমরা জানি যে, ভক্তের নিকট তিনি রসময় লীলাময় নিখিল কল্যাণ গুণের আকর মাধুর্যঘন প্রেমঘন ভগবান। তাঁর যশোগাথা সম্পর্কে তাই ভাগবত বলেন: উত্তম শ্লোক ভগবানের মহিমা কীর্তনই মনোরম, তা রম্য রুচির, নিত্যই নতুন, তা নিত্যকাল মানবমনের মহোৎসব, তা মনুষ্যগণের শোকার্ণব শোষণ বা শোকনাশন ॥

তদেব রমাং রুচিরাং নবং নবং
তবেব শশ্বন্মনসো মহোৎসবং।
তদেব শোকার্ণব শোষণং পৃণাম্
যদুত্তম শ্লোক যশোহনুগীয়তে ॥

ফল কামনা পরিত্যাগ করে অব্যবধানে ভগবানের ভজনাই ভক্তি-যোগের লক্ষণ বলে ভাগবতে কথিত হয়েছে। শিক্ষাষ্টকে শ্রীমন্মহা প্রভু বলেছেন: আমি ধন চাই না, জন চাই না, সুন্দরী চাইনা, কবিতাও চাই না। হে জগদীশ্বর, জন্মে জন্মে তোমার প্রতি যেন আমার অহৈতুকী ভক্তি থাকে। গীতায় উক্ত হয়েছে : ন মে ভক্তঃ প্রণশ্যতি—আমার

ভক্ত কখনো বিনাশপ্রাপ্ত হয় না। প্রহ্লাদঅম্বরীস প্রমুখ মহাত্মার জীবনীই প্রমাণ করে যে, তিনি তাঁর ভক্তকে সহস্র বিপদ থেকে রক্ষা করে থাকেন। নাম গ্রহণের দ্বারা ও অন্যান্য উপায়ে ভগবানের ভক্তি-যোগই মানুষের পরমধর্ম বলে ভাগবতে উল্লেখিত হয়েছে। তাই কর্ম-যোগ, জ্ঞানযোগ ও ধ্যানযোগের পথ পরিত্যাগ করে একমাত্র ভক্তি-যোগের মাধ্যমে তাঁকে পাওয়া যায়; কারণ, তিনি কেবলমাত্র ভক্তিরই বশীভূত। এ ভক্তিজ্ঞান কর্মাদানাবৃত্ত। ভক্তি সম্বন্ধে ভগবান স্বয়ং বলেন: 'হে দ্বিজ, পরাধীন ব্যক্তির মত আমি ভক্তের অধীন। সাধু-ভক্তগণ আমার হৃদয় অধিকার করে আছে; আমি ভক্তগণের প্রিয়, ভক্তগণও আমার প্রিয়।' তিনি আরো বলেন, 'যারা স্ত্রী পুত্র গৃহ আত্মীয় প্রাণ ধন সম্পদ ইহলোক পরলোক সব পরিত্যাগ করে একমাত্র আমারই শরণ গ্রহণ করে, তাদের আমি পরিত্যাগ করি কিরূপে?' অন্যত্র, 'সাধুগণ আমার হৃদয়সদৃশ, আমিও তাদের হৃদয়স্বরূপ, আমা ভিন্ন তারা আর কিছু জানে না; আমিও তাদের ছাড়া আর কিছু জানি না।' আবার, 'যে সব সমদর্শী সাধু আমাতে হৃদয় নিবদ্ধ করেছে, তারা আমাকে ভক্তিযোগে বশীভূত করে, যেমন সতী স্ত্রী সৎ পতিকে (তার অবলা ভক্তিযোগে) বশীভূত করে থাকে।'

ভগবান বলেন, আমি বৈকুণ্ঠে বাস করি না, যোগীর হৃদয়েও নয়, আমার আসন ভক্তের হৃদয়কমলে :

না হং তিষ্ঠামি বৈকুণ্ঠে যোগী নাং হৃদয়ে নচ।
মদ্ভক্তা যত্র গায়াতিতত্র বসামি নারদ॥

এ-ই পরম সত্য যে, শ্রীভগবানে রতি প্রগাঢ় হয়েই ক্রমে তা প্রেমে রূপান্তরিত হয়। তখন ভক্তের জীবনে ঘটে দিব্যরূপান্তর। বাইবেলে (New Testament)ও এ-রূপান্তরের কথা পাই। রূপসাগরে অবগাহনরত Jeremiah-র রূপান্তর ঘটেছে, তাই তাকে বলতে শুনি :

The Lord hath appeared of late unto me, saying,—
yea, I have love thee with everlasting love,
therefore, with loving Kindness have I drawn thee.

ভক্তিমার্গে ভক্তের অবস্থান্তর ঘটলে, 'সে অবিনশ্বর ভগবানের চিন্তায় ভক্ত কখনও কাঁদে, কখনও হাসে, কখনও আনন্দসাগরে মগ্ন হয়ে

পুলক শিহরণ অনুভব করে, কখনও অলৌকিক বাক্য বলে, কখনও নাচে, কখনও লীলা সংকীর্তন করে, আবার কখনও সুখাতিশয্যে মৌনতা অবলম্বন করে।' এই যে অতুলনীয় ভক্তি এতো ভগবানের রস-রূপেরই উপাসনাজাত। এর মাধ্যমেই মানুষ ত্রিগুণাতীত হতে পারে। আর ত্রিগুণাতীত হতে পারলেই প্রকৃতির বন্ধন অতিক্রম করা যায়। উপনিষদ ব্রহ্মের ব্যাখ্যায় বলেছেন: তাকে না পেয়ে বাক্য মনের সঙ্গে ফিরে আসে, চক্ষু বাক্য বা মন সেখানে গমন করে না।' অন্যত্র বলা হেয়েছে: তাঁর হাত নেই, তিনি কাজ করেন; তাঁর কর্ণ নেই, তিনি শ্রবণ করেন; তাঁর পা নেই, তিনি গমন করেন; তাঁর চোখ নেই, তিনি দর্শন করেন; তিনি মহান পুরুষ বলে কীর্তিত হন।

তৈত্তরীয় উপনিষদে বলা হয়েছে, ব্রহ্ম রসস্বরূপ:

রস বৈ সঃ।
রসং হ্যে বায়ং
লব্ধা আনন্দী ভবতী। (শ্লোক ২।৭॥)

বৃহদারণ্যক উপনিষদে বলা হয়েছে:

তদেতৎ প্রেয়ঃ পুত্রাৎ প্রেয়ো
বিত্তাৎ প্রেয়োহন্যস্মাৎ সর্বস্মাৎ
অন্তর তরং খদয়মাত্মী। (মন্ত্র ১০।৮॥)

—এই পরমাত্মা সর্বাপেক্ষা অন্তরতম। পুত্রের চাইতে প্রিয় তিনি; বিত্তের চাইতে প্রিয় তিনি; অন্যান্য সকল কর্ম অপেক্ষাও প্রিয় তিনি। এ উপনিষদেই আবার বলা হয়েছে: 'ইনিই আত্মার পরম গতি। ইনিই আত্মার পরম সম্পদ; ইনিই আত্মার পরম লোক, ইনিই আত্মার পরম আনন্দ। এর আনন্দ স্বরূপ পরমেশ্বরের কণামাত্র আনন্দ সমুদয় জীব উপভোগ করে থাকে।' এই পরমাত্মাকেই উপাসনার কথা বলা হয়েছে। যে এই পরমাত্মাকে প্রিয়রূপে উপাসনা করে, সে তাঁর প্রিয়, সে কোনদিন বিনষ্ট হয় না, সে অবিনশ্বর।

এই যে রসস্বরূপ শ্রীভগবানের উপাসনা তা ভারতের একার নয়। প্রাক্‌বৈদিক যুগের ইতিহাস থেকে আরম্ভ করে অতি আধুনিক কালে এসেও এ রস-স্বরূপ ভক্তিরসাশ্রিত সাধনা-ভজনা ইরান ও মধ্য-ইউরোপ পর্যন্ত বিস্তার লাভ করে। দেশে দেশে কালে কালে এর পদ্ধতি,

স্বরূপ ও বাহ্যরূপ বদলালেও মূলত ভাবুক চিত্তে এর প্রেরণার উৎস সার্বজনীন।

খ্রীষ্টীয় মিস্টিক সাধকদের সাধনা ও মুসলিম সূফীভক্তদের ধ্যান-ধারণায় খ্রীষ্টধর্ম ও ইসলামের প্রভাব ও মানসিকতা এবং তার সহিত তুলনায় ভারতীয় সাধনায় ভাগবতের ধারা—এ সবের এক অদ্ভুত সংমিশ্রণজাত সাধর্ম্য অথচ পরিচ্ছন্ন পার্থক্য লক্ষণীয় ধারায় প্রবাহিত।

দুই

সাংখ্যমতে প্রকৃতি ও পুরুষ অনাদি ও নিত্য। প্রকৃতি জড়, কিন্তু পুরুষ চেতন। প্রকৃতি বিষয় পুরুষ বিষয়ী অর্থাৎ প্রকৃতি কর্ম (object) পুরুষ কর্তা (subject)।

হার্বার্ট স্পেনসরের মতে বস্তুর উৎপত্তি ও বিনাশ নেই; অবস্থান্তর আছে। স্যার উইলিয়াম ব্রুক্স বলেন : সমস্ত মৌল উপাদান বা পদার্থ (elements) এক চরম উপাদান বা পদার্থের (Protyle) বিশেষ অবস্থায় বিশেষ সংঘাতজনিত বিকারমাত্র। এ চরম উপাদান ও মৌল পদার্থই প্রকৃতি।

সাংখ্যমতে প্রকৃতি ও পুরুষ বিশ্বের চরম দ্বৈতরূপ (Ultimate quality)। গীতার সাংখ্যোক্ত এ প্রকৃতি ও পুরুষকে পরম পুরুষের দুটি সত্তা বিধা বা Aspect বলে স্বীকার করা হয়েছে। গীতার মতে পরম পুরুষই চরমতত্ত্ব সাংখ্যোক্ত প্রকৃতি ও পুরুষ চরম নয়। জীব ও জড় এ দুয়ের সমন্বয়ে যে একত্বে উপনীত হওয়া যায়, সাংখ্যে তার আভাস না থাকলে গীতায় তা স্পষ্ট হয়ে উঠেছে।

প্রখ্যাত দার্শনিক ম্যাক্সমুলার তার 'ইন্ডিয়ান ফিলসফি' গ্রন্থে এ-কথারই স্বীকৃতি দান করেছেন। তিনি বলেন : It was true that sankhya philosophy was accused of atheism but that atheism was very different from what we meant by it. It was the negation of the necessity of admiting an active or limited personal God.[৯]

পরবর্তীকালে পতঞ্জলি যে-তত্ত্ব প্রকাশ ও প্রচার করেন, তাতে ঈশ্বরকে সাংখ্যোক্ত পুরুষ বলে স্বীকার করা হয় নি, তাতে প্রকৃত-প্রস্তাবে যে ঈশ্বরতত্ত্ব ব্যাখ্যাত হয়েছে তাকে 'ঈশ্বর-সাংখ্য' বলা যেতে পারে।

বেদান্তেও গীতার মতের সমর্থন পাওয়া যায়; সাংখ্যের দ্বৈতবাদের স্বীকৃতি সেখানে অনুপস্থিত। বেদান্তের মতে ব্রহ্মই একমে বা দ্বিতীয়ম, ব্রহ্মই চরম; এবিশ্বে বিভিন্ন ভূতে বিকশিত সয়ম্ভূ (খোদা) ভিন্ন আর কিছুরই অস্তিত্বের স্বীকার করা যায় না।

প্রকৃতি ছাড়া আরো একটা উপাদান বা ভূতের অস্তিত্ব স্বীকার করা হয়। তার নাম শক্তি—Power, force বা energy। এ force আবার দু' রকমে প্রকাশ পায়। এক প্রকার হলো জৈবশক্তি বা Physical force এবং দ্বিতীয় প্রকার হলো জীবশক্তি বা psychic force। জৈব-শক্তি বা physical force-কে কয়েক ভাগে ভাগ করা হয়েছে: তাপ বা heat, আলো বা light, বিদ্যুৎ বা electricity, আকর্ষণ বা magnetism। জীবশক্তি বা psychic force-কে দু'ভাগে ভাগ করা হয়েছে : জীবশক্তি psychic force এবং প্রাণশক্তি বা vital force.

ভারতীয় দর্শন এ-মৌল উপাদানগুলোকে ভূত নামে আখ্যাত করেছেন। উপনিষদের পঞ্চভূত : ক্ষিতি, অপ, তেজ, মরুৎ ও ব্যোম উপরোক্ত মৌল উপাদানগুলোরই নামান্তর মাত্র। জরথুস্ত্রবাদীদের মতে এগুলোই আবার আব, আতশ, খাক ও বাদ—এ চার উপাদানে রূপ পেয়েছে।

অদ্বৈত মতে যারা বিশ্বাস করেন তাঁদের মতে, জীবই ব্রহ্ম, তবে আমাদের কাছে জীব ও ব্রহ্মের যে বিভিন্ন রূপ প্রতীয়মান হয়, তা বস্তুত সত্য নয়, তা মায়া মাত্র। জীব ও ব্রহ্ম যে বিভিন্ন এ তত্ত্ব-জ্ঞান দৃঢ় হলেই অবিদ্যা ও মোহের নিবৃত্তি ঘটে। তাই অদ্বৈত মতে জীব ও ব্রহ্মজ্ঞানের ঐক্যজ্ঞানই মুক্তির উপায়।

গৌতম বুদ্ধ জীব ও ব্রহ্মজ্ঞানের এ-ঐক্যবোধের সীমান্তে এসে সর্বজ্ঞানের বিসর্জন দেওয়ার প্রত্যয়েই নির্বাণের পথ খুঁজেছেন।

বিশিষ্ট অদ্বৈত মতে আরো একটু এগিয়ে এসে বলা হয়েছে: পরম পুরুষ থেকেই জীবের উৎপত্তি; তাতেই তার স্থিতি এবং তাতেই তার লয়। এখানে ইসলামের স্মরণ করা যেতে পারে, 'মিনহা খালাক-নাকুম, ফিহা নুয়িদুকুম ওমিনহা নুখরে জুকুম, তারাতান উখরা।'[২] অর্থাৎ তা (মৃত্তিকা) থেকেই তোমাদের সৃষ্টি করেছি, তাতেই তোমাদের ফিরিয়ে নেব এবং তা থেকেই তোমাদের আবার বের করব।

বিশিষ্ট অদ্বৈত মতে পুরুষ ও প্রকৃতি উভয়ের মধ্যেই পরমপুরুষ বা পরমেশ্বর অন্তর্যামীরূপে বিরাজমান। অর্থাৎ প্রকৃতি ও পুরুষের মধ্যে পরম পুরুষেরই বিকাশ ঘটে। তাই প্রকৃতি ও পুরুষ এ দুটি পরমপুরুষের প্রকার, বিভাগ বা রূপ ভেদমাত্র। চিৎ ও জড় তারই নজীররূপে তারই রূপ বা প্রকাশ মাত্র। তিনি আত্মায় থেকে আত্মার অন্তরে অবস্থিত। আত্মা থেকে জাত নহে; আত্মা তার শরীর। তিনি আত্মায় থেকে আত্মারই অন্তর্যামী। বিশিষ্ট অদ্বৈত মতে, ব্রহ্মা যখন অত্যন্ত ব্যস্ত, তখন জীব কোন মতেই ব্রহ্মাংশ বা খণ্ড ব্রহ্মা হতে পারে না। জীব ব্রহ্মের বিভূতি। এঁদের মতে পরম পুরুষ বা মুক্ত পুরুষ কোন মতেই ব্রহ্মের স্বরূপঐক্য লাভ করতে পারেন না। এ তাঁর স্বভাব বা 'যাতে' (নাম বা বিশেষ্য)[৩] বা সত্তায় নাই। পুরুষ ও প্রকৃতি ব্রহ্মের স্বভাবপ্রাপ্ত হন বটে, ব্রহ্মোচিত গুণ লাভ করেন বটে কিন্তু ব্রহ্মের সঙ্গে একীভূত হন না। অর্থাৎ এ তাঁর 'সিফাত' (গুণ বা বৈশিষ্ট্য) মাত্র। অদ্বৈতবাদীর মতে মোহমুক্ত জীব ব্রহ্মের সহিত একত্বপ্রাপ্ত হয়। দ্বৈতবাদের মুক্তি ঠিক এরূপ নয়। এখানেই দ্বৈত ও অদ্বৈতবাদের পার্থক্য।

শংকরের মতে নির্গুণ ব্রহ্মই সত্য, সগুণ ব্রহ্ম সত্য নহে। অর্থাৎ যা ঘটে তা সব সত্য নহে। মায়াবাদীদের মতও অনুরূপ। রামানুজের মতে একমাত্র সগুণ ব্রহ্মই সত্য; নির্গুণ ব্রহ্ম অসত্য। অদ্বৈতবাদীরা ব্রহ্মকে সগুণ সবিশেষ ও সালঙ্কার বলে বিশ্বাস করেন। এঁদের মতে পরমপুরুষ ব্রহ্ম প্রেমময়. দয়াময় ও শক্তিময়।

গীতাও এমতের সমর্থন ও পোষণ করে। অদ্বৈতবাদীর মত দ্বৈতভেদ বা প্রকৃতিভেদ মায়া বা কল্পনা মাত্র। বিশিষ্ট দ্বৈতবাদীর মতে জগতে যে বিভিন্ন বৈচিত্র্যের লীলা প্রত্যক্ষ হয়, তা ব্রহ্ম বা পরম পুরুষেরই

প্রকার বা বিধা (Aspect)। বিধার মাধ্যমে প্রকৃতির কাছে স্পষ্ট প্রকাশিত বলেই তাঁর নাম বিধি। আর যে ভাবে বিভাবিত হয়, বা যে নিয়মে নিয়ন্ত্রিত হয়, তারই নাম বিধান বা নিয়ম। সেমিটিক শাস্ত্রে যাকে বলে 'আল-হুক্‌মু'।

গীতার মতে—প্রকৃতি ও পুরুষ, জড় ও চিৎ উভয়ই পরমাত্মার বা ব্রহ্মের প্রকার বা বিধা। এ দুয়েরই সংযোগে সমস্ত ভূতের (elements) উৎপত্তি। যা নিহিত বা বিলীন (Potent) তার প্রকাশই সৃষ্টি (emergence)। এ বিশ্বে নিষ্প্রাণ উপাদান (dead matter)-এর অস্তিত্ব নেই। সব কিছুই বা সব ভূতই তাঁর জীবনে বা বিধায় উজ্জীবিত ও তাঁর 'নূরে' বা ভাতিতে আলোকিত ভাস্বর চিন্ময়। ব্রহ্ম থেকেই সকল বস্তুর উৎপত্তি, তাতেই তাদের জীবন এবং পরিশেষে তাতেই সব বিলীন হবে। এ জগৎ মায়া বা কল্পনা নয়, অলীক নয়, জগতে যা কিছু আছে, তা হয় প্রকৃতি না হয় পুরুষ।

প্রকৃতি ও পুরুষ যখন পরম ব্রহ্মেরই বিধা বা প্রকার, তখন এক ব্রহ্ম ব্যতীত আর কিছুরই অস্তিত্ব খোঁজা নিরর্থক। তিনি এক অদ্বিতীয়, তাঁর মতো কেউ নেই। তাঁকে ছাড়া বহু নেই। তিনিই বহু বিধায় বিকশিত। তাই তিনি 'একমে বা দ্বিতীয়ম'। তিনি ইচ্ছাময়। যখন তিনি বহু হওয়ার ইচ্ছা পোষণ করেন, ইরাদা করেন, তখনই তিনি 'বহু স্যাম'—'আমি বহু হব' বলে নানা বিধায় বিভাত হন।

সেমেটিক মতে আল্লাহ এক, অদ্বিতীয়, অভাবশূন্য, তিনি জনকও নহেন, প্রজাতও নহেন, তার সমকক্ষ, সমজাতের সমবিধায় কিছু নাই, তিনি একক। আল্লাহ আকাশ ও পৃথিবীর আলো অর্থাৎ তাঁর আলোতেই সৃষ্টি দৃষ্টিগোচর বিভাত। বিধান বিহিত বা নির্দেশনা তাঁরই।[৫] তিনি ইচ্ছাময়, সর্বশক্তিমান। যখনই তিনি কোন কিছুর ইচ্ছা পোষণ করেন, তিনি বলেন: 'হও'; আর অমনি হয়ে যায়।[৬] অর্থাৎ এ-পরিদৃশ্যমান জগৎ তাঁরই ইচ্ছায় সৃষ্ট তাঁরই ইচ্ছায় বিধা। তাঁর ইচ্ছার উপরে কারো ইচ্ছা কার্যকরী হওয়ার নয়। সাধারণ ভাষায় 'খোদার উপর কারো খোদকারীর' অবকাশ নেই।

আত্মা বা রূহের বিনাশ বা মৃত্যু নেই। শরীরের বিনাশে আত্মার বিনাশ হয় না। যেমন কোন দৃশ্য যা আমি দেখেছি; আমার মনে

অঙ্কিত হয়ে রয়েছে, সে দৃশ্যের আবির্ভাব আর ঘটবে না, কিন্তু আমার কাছে তার ছবি চিরন্তন স্বাক্ষর রেখে গেছে। 'সে নবজগতে কাল স্রোত নাই ; পরিবর্তন নাহি।'[৭]

আত্মা নিত্য শাশ্বত। সাধারণতঃ চিদাভাসই, যাকে brain consciousness বলা হয়, আমাদের নিকট আত্মা বলে প্রতীয়মান হয়। আরও একটু এগিয়ে গেলে, আবার মন বা mind প্রজ্ঞা বা intellect এবং ইচ্ছা বা will-কেই আত্মা বলে মনে হয়। কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে এদের কোনটিই আত্মা নয়। এগুলো অপরাপর বিধামাত্র। এ সবগুলোকে মিলিয়ে নিম্নস্তরের আত্মা বা lower self বলা চলে। এগুলো কিছুতেই উর্ধ্বস্তরের আত্মা বা higher self নয়। অন্য কথায় এগুলো চিন্মাত্র নয়, চিদাভাস মাত্র।[৮] চিদাভাস যখন আত্মায় বিলীন হয়, কেবলমাত্র তখনই বলতে পারে 'সোঅহং'—তিনিই আমি এবং 'অহংব্রহ্মাস্মি'—আমিই ব্রহ্ম।

কথাটা রূপকে এভাবে বলা যায় : শিশিরবিন্দু সমুদ্র নহে, কিন্তু সমুদ্রের আভাস এতে আছে। এ শিশির বিন্দুকে চিদাভাস বা lower self বলে মনে করে নিলে, এবং সমুদ্রকে চিন্ময় higher self মনে করে নিলে, শিশির বিন্দু যখন সমুদ্রে নিমজ্জিত হয়, তখনই সে বলতে পারে সমুদ্রই আমি, আমিই সমুদ্র। অর্থাৎ লীন অবস্থায় 'তিনি ও আমি', 'সো' এবং 'অহং' তথা সমুদ্র ও শিশিরের পার্থক্য-জ্ঞান লুপ্ত হওয়াই স্বাভাবিক। যখন আলাদা সত্তা নেই তখন আলাদা করে বলব কি করে। এ যেন অনেকটা শরবতের মতো। চিনি ও পানি যখন মিশে গেছে, তখন পানি এবং চিনি, প্রত্যেকের পক্ষে যেমন 'শরবতই আমি' এবং 'আমিই শরবত' বলায় অসঙ্গতি দেখি না, তেমনি 'সত্যই আমি' 'আমিই সত্য'—'আনাল হক' বলায়ও অসঙ্গতি আছে বলে মনে করি না।

ভাগবতে এ 'অহং'কে এভাবে দেখা হয়েছে : ভগবান চিৎ ও কর্মময়। তার ইচ্ছা রূপ পরিগ্রহ করে জগতে অবতীর্ণ হন, দুষ্টের দমন ও শিষ্টের পালনের জন্য, সৃষ্টির রক্ষার জন্য—তাঁর অংশাবতার রূপে। তাই তিনি বলেন : 'যুগে যুগে সম্ভবামি' ; যুগে যুগে আমি স্বরূপে প্রকাশিত হই। সে কারণেই দেখা যায় যে, শ্রীকৃষ্ণ ভগবানেরই

স্বরূপ, তারই অংশ। শয়তানের তাণ্ডবলীলায় ধরিত্রী যখন টলটলায়মান তখন তা রক্ষার উদ্দেশ্যে ভগবান নিজেই কৃষ্ণরূপ ধারণ করে ধরায় নেমে আসেন। তাঁর মানবীয় লীলা তাই ভগবতলীলারই নামান্তর। তাঁর জীবলীলা একটা প্রতীকী আভাস মাত্র। তিনি পরমপুরুষ স্বয়ং ভগবান স্রষ্টা এবং পালনকর্তা অর্থাৎ ভর্তা। ষোড়শ সহস্র গোপিনী প্রকৃতি বা সৃষ্টি। সৃষ্টির মধ্যে নানাভাবে, নানা বিধায় বিভাসিত তিনি পুত্র-বন্ধু-সখা হিসেবে কেলী করেছেন। তাঁরই ইচ্ছায় নিজেকে একান্তভাবে সমর্পণ করা, আপন সত্তা বিলিয়ে দেওয়াই সৃষ্টির কর্ম ও কর্তব্য আর তাই সৃষ্টির উদ্দেশ্য। ভাগবতের পরমেশ্বরের বিষ্ণু অবতার পরিকল্পে অংশাবতার হিসেবে কৃষ্ণকে ভগবান জ্ঞানে সাধনা ভজনা করা তাই এক শ্রেণীর লোকের ধর্মমতে পরিণত হলো। এরাই বৈষ্ণব। ভাগবতের মতে ভক্ত ও ভগবানের সম্পর্ক, কর্তা ও কর্মের সম্পর্ক; বিষয়ী (Subject) ও বিষয় (Object) এর সম্পর্ক। সৃষ্টিই ভক্ত, স্রষ্টাই ভগবান। ভক্তের কর্তব্য ভগবানের পূজা করে যাওয়া। বর দেওয়া-না দেওয়া ইচ্ছাময়ের ইচ্ছা। কিন্তু ভাগবতীয় বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের অনুধ্যান ও অনুষ্ঠান কেবল ভাগবতোক্ত শ্রীকৃষ্ণেই সীমাবদ্ধ রইল না। আরো নানা অবতারবাদ ক্রমে তাঁদের বিশ্বাস তথা অনুষ্ঠানকেও আচ্ছন্ন করে ফেলল।

পরে পঞ্চদশ শতাব্দীতে শ্রীচৈতন্যদেবের আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গে এ-ভাবধারায় যেমন এলো পরিবর্তন, তেমনি এর অনুষ্ঠানেও এলো সংশোধন, সংযোজন ও বিয়োজন। ভক্ত ভগবানের সম্পর্ক মেনে নিয়ে বৈষ্ণবগণ নিজস্ব চিন্তাধারা অনুযায়ী শ্রীকৃষ্ণকেই ভগবানের অবতার অর্থাৎ সাক্ষাৎ ভগবান মানবরূপে পৃথিবীতে অবতীর্ণ হয়েছেন মনে করেন। তাদের মতে ভগবানকে সেবা করা মানেই কৃষ্ণকে সেবা করা। রাধা ভাবে বিভাবিত বৈষ্ণব সে ভাবেই ভগবান কৃষ্ণকে ভজনা করেছেন। চৈতন্যদেবের আমলে প্রচারিত পরিবর্তিত ও সংস্কৃত বৈষ্ণব ধারায় এ সংস্কারের সঙ্গে যুক্ত হল আরও একটি ভাব। ভক্তগণ বিশ্বাস করলেন শ্রীচৈতন্যের মধ্যে ভগবানের দ্বিভাবে বিহারকল্প-শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীরাধা একই মূর্তিতে মানব রূপে রূপ পরিগ্রহ করেছেন। এ রাধা-কৃষ্ণ যুগলকল্প ধ্যানে শ্রীচৈতন্য তৎকালে শ্রীকৃষ্ণের মত পূজিত হতে থাকলেন। শ্রীরাধা যেমন প্রেয়সী রূপে শ্রীকৃষ্ণের অনুরাগে জীবন কাটিয়েছেন এবং

তাঁর মধ্যেই যেমন সত্যিকারের ভক্তের স্বরূপ ফুটে উঠেছে, ঠিক তেমনি গৌরাঙ্গরূপে আত্মাহুতি দিয়ে পরবর্তীকালে ভক্ত বৈষ্ণব নিজেকে বিলীন করে দেওয়াতেই তাঁর সাধনার সার্থকতা খুঁজেছেন। তাই বাৎসল্য, সখ্য, দাস্য, মধুর ইত্যাদি নানা রসে সিক্ত করে বৈষ্ণব নিজের ভক্তি অভিব্যক্ত করতে চেয়েছে। কৃষ্ণের সহিত চরম মিলনে সুখ একমাত্র মধুর বা প্রেমরসেই। এতেই জীবের স্ফূর্তি ও সৃষ্টির সমৃদ্ধি। তাই প্রেয়সী রূপে শ্রীকৃষ্ণকে নিজের দায়িত্বজ্ঞানে সেবার মাধ্যমে সর্ব-ধর্ম-কর্মের অভিব্যক্তি জ্ঞান করা হলো। ভগবান পুরুষ ভক্তপরা বা প্রকৃতি। পুরুষের কামনা-বাসনায় নিজেকে বিলিয়ে দিয়েই নিজের অস্তিত্ব যেমনটি উপলব্ধি করা যায়, তেমনটি আর কিছুতে নয়। তাই বৈষ্ণবের কাছে ভগবান প্রেমিক, দয়িতা এবং ভক্ত প্রেয়সী দয়িতা। সেজন্য শ্রীমতী রাধিকার জবানীতে যখন রাধাভাবে বিভাবিত ভক্ত বলেন:

সই কেবা শুনাইল শ্যামনাম।
কানের ভিতর দিয়া মরমে পশিল গো
আকুল করিল মোর প্রাণ॥

অথবা,

রূপ লাগি আঁখি ঝুরে
গুণে মন ভোর,
প্রতি অঙ্গ লাগি কাঁদে
প্রতি অঙ্গ মোর।

তখন বুঝতে বাকি থাকে না যে, এ রাধা, প্রেম পাগলিনী রাধা। এ প্রেম যখন ঊর্ধ্বে উঠে রাধাকে ভাবের তুরীর মার্গে নিয়ে যায়, তখন দেহ বা বস্তু—কিছুরই সম্পর্ক থাকে না, যা থাকে তা হলো:

রজকিনী প্রেম
নিকশিত হেম
কাম গন্ধ নাহি তায়।

রূপজ মোহ, দেহজ প্রেম বৈষ্ণবের প্রেম নয়। প্রেয়সী বিরহিনী উন্মাদিনী রাধাভাবে বিভাবিত ভক্তের প্রেমিক দয়িত কৃষ্ণের কাছে

আত্মসমর্পণেই আনন্দ, আর তা-ই চরম চাওয়া ও পাওয়া। এর বাইরে সে ভাবতে পারে না। পারে না বলেই, সে কেঁদে বলেঃ

জনম অবধি হাম রূপ নেহারলুঁ
নয়ন না তিরপিত ভেল।
লাখ লাখ যুগ হিয়ে হিয়ে রাখলুঁ
হিয়ে জুড়ন না গেল॥

একথা স্মরণীয় যে, ভাগবতের ঊনত্রিশ থেকে তেত্রিশ অধ্যায়ে যে রাসলীলার বর্ণনা আছে, তাতে যে প্রেমের লীলা বর্ণিত হয়েছে, তা আদৌ জাগতিক প্রেম নয়। ব্রজ গোপীগণের এ-প্রেম অপ্রাকৃত। তাদের আত্মেন্দ্রিয় প্রীতি বাঞ্ছা ছিলনা। রাসলীলার প্রথম শ্লোকটি এরূপঃ

ভগবানপিতা রাত্রীঃ শারদোৎফুল্ল মল্লিকাঃ।
বীক্ষা রন্তুঃ মনশ্চক্রে যোগ মায়া মুপাশ্রিতঃ॥

অর্থাৎ শ্রীভগবান কৃষ্ণ দেখলেন, সে শারদ পূর্ণিমা রজনীতে মল্লিকা কুসুম বিকশিত; তাই তিনি যোগমায়াকে আশ্রয় করে ব্রজগোপীদের সঙ্গে ক্রীড়া করতে অভিলাসী হলেন।

শ্লোকটির তাৎপর্য অত্যন্ত গভীর। এ তাৎপর্য উপলব্ধ না হলে বৈষ্ণব রস-সম্মেলন অনাস্বাদিতই থেকে যাবে। অধ্যাপক হীরেন্দ্রনাথ দত্ত এ-লীলা রসের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে উল্লেখ করেছেন যে, এর ভিতর অসীমের প্রতি সসীমের শাশ্বত দীর্ঘশ্বাস, একটি yearning of the individual souls after the infinite কেবলি গুমরে মরছে। অধ্যাপক ত্রিপুরাশঙ্কর সেন শাস্ত্রী সঙ্গতভাবেই উল্লেখ করেছেন যে, যে মহাভাবময়ী রাধা নায়িকা শিরোমনি, যিনি কৃষ্ণ সুখৈক তাৎপর্যময়ী, গোপিকাগণের মধ্যে যিনি শ্রেষ্ঠা, যাঁর অপ্রাকৃত প্রেমলীলা অবলম্বন করেই জয়দেব, বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাস প্রভৃতি পদকর্তাগণ অজস্র মধুর কোমলকান্ত পদাবলী রচনা করেছেন, গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণের মতে, যাঁর ভাবকান্তি অবলম্বন করেই স্বয়ং ভগবান শ্রীকৃষ্ণ গৌরাঙ্গরূপে ধূলার ধরায় অবতীর্ণ হয়েছিলেন, তাঁর নামের স্পষ্ট উল্লেখ কোথাও শ্রীমদ্ভাগবতে নেই। অবশ্য রসিক ভক্ত-জনের সিদ্ধান্ত এই যে, ভাগবতে ইঙ্গিতে এমন একজন গোপিকার কথা বলা হয়েছে, যিনি গুণসমূহের দ্বার, গোপিকাগণের মধ্যে বরিষ্ঠা। শ্রীকৃষ্ণ

যখন গোপিকাগণের সঙ্গে নৃত্য করতে করতে রাস-মণ্ডল থেকে অন্তর্হিত হন, তখন ব্রজ সুন্দরীগণ একজন সৌভাগ্যবতী নারীর পদচিহ্ন আবিষ্কার করে বলেন:

অনয়ারাধিতো নূনং ভগবান হরিরীশ্বরঃ।
যন্নো বিহায় গোবিন্দঃ প্রীতি যামনয়দ্রহ ॥[৯]

এ থেকে বুঝতে কষ্ট হয় না যে, শ্রীকৃষ্ণ নিশ্চিতই আরাধিত হয়েছেন। যেহেতু শ্রীগোবিন্দ আমাদের ছেড়ে প্রীত হয়ে এঁকে নির্জনে নিয়ে এসেছেন, তাই সিদ্ধান্ত এই যে, যিনি শ্রীকৃষ্ণের আরাধিকা, তিনিই 'রাধিকা'। 'রাধিকা' পরবর্তীকালে 'রাধা', আরও পরে 'রাহি' এবং 'রাই'—এসবই পরবর্তী ভক্তিশাস্ত্র ও কাব্যানুশীলনের পরিচর্যাজাত শব্দ বা term। 'সাধিকা' অর্থে 'রাধিকাই' সর্বত্যাগিনী হয়ে তাঁর প্রেমে গৃহত্যাগ করেন। তাঁর বংশীধ্বনি তাঁর কানের ভিতর দিয়া মরমে পশে, মন ব্যাকুল করে তোলে, 'রান্ধন' আউলিয়ে দেয়। ভক্তি মার্গে ভক্তের প্রতীক, প্রকৃতি স্বরূপা অপ্রাকৃত রাধাই বৈষ্ণবভক্তের আত্মরতির নিধিধ্যাসন। শ্রীমতি যখন বলেন:

কেনা বাঁশী বাএ বড়ায়ি কালিনী নই কূলে।
কেনা বাঁশী বাএ বড়ায়ি এ গোঠ গোকুলে॥
আকুল শরীর মোর বেআকুল মন।
বাঁশীর শবদে মো আউলাইল রান্ধন॥[১০]

তখন বুঝতে বাকী থাকেনা এ রাধা বা এ সাধিকার অন্তর্দাহ কোথায়। তাই তাঁর মুখে আবার শুনি:

পাখি নহোঁ তার ঠাই উড়ি বাড়ি জাওঁ।
মেদনী বিদার দেউ পসিয়াঁ লুকাওঁ॥
বনপোড়ে আগ বড়ায়ি জগজনে জানী।
মোর মন পোড়ে যেহ্ন কুম্ভারের পণী॥[১০]

এ পার্থিব জগতের 'আভাস' তাঁকে পাগল করেছে, অপার্থিব জগতের ধ্যানে মুগ্ধ করেছে।

তিন

মুসলিমের চিন্তাধারায় এ ভাব কী রূপ পেয়েছে তার স্বরূপ বিশ্লেষণ করে দেখা যাক।

মুসলিম সূফী মতে আল্লাহ নির্গুণ নয়, সগুণ। সব কিছুই আল্লাহ থেকে সৃষ্টি হয়েছে সত্য, কিন্তু সবটাই একটা নিয়মের ভেতর দিয়ে হয়েছে, বিধান অনুসারে হয়েছে। সে নিয়ম কি? সে নিয়ম হলো: হযরত রসূলে করীম (সাঃ) নিজেই বলেছেন, 'আনা মিন নূরিল্লাহে ওয়াকুল্লু শায়য়িন মিন নূরী'---আমি আল্লাহর নূর থেকে সৃষ্ট এবং জগতের তামাম বস্তু আমার নূর থেকে সৃষ্ট।[১১]

আল্লাহ গোপন ছিলেন প্রকাশ হতে চাইলেন, সৃষ্টি করতে চাইলেন। তাই তিনি স্বীয় অস্তিত্ব থেকে, নিজের নূর থেকে আর এক অস্তিত্বের, তার এক নূরের সৃষ্টি করলেন। তা-ই 'নূরে মুহম্মদী', এ নূরে মুহম্মদী তার 'বিধা' বা প্রকার নয়। সে নূর তৈয়ার করতে গিয়ে তিনি দ্বিধা বিভক্ত হলেন না। বাতি থেকে বাতি জ্বাললে যেমন উভয়ই এক থেকে উদ্ভূত, একই সত্তা অথচ একে অপর থেকে পৃথক, আল্লাহর নূর থেকে নূরে মুহম্মদী সৃষ্টি করাও তদ্রূপ। এ নূরে মুহম্মদীই সৃষ্টির মূলীভূত কারণ বা পুরুষ এবং সৃষ্টিই প্রকৃতি বা জড়। উভয়ের মূল উৎস সেই একমে বা—দ্বিতীয়তম বা এক ও অদ্বিতীয় পরম বিধায়ক স্রষ্টা ও পালনকর্তা।

জড় বা প্রকৃতি চিৎ বা আত্মার 'বিধা' বা প্রকার নয় বরং চিৎ 'বাতেন' (গুপ্ত) এবং প্রকৃতি বা জড় তার বহিঃপ্রকাশ বা 'জাহেরী' রূপ মাত্র। কুরআনে বলে: হুয়াল আউয়ালু ওয়াল আখেরু, হুয়াজ্জাহেরু ওয়াল বাতেনু---তিনি আদি ও তিনিই অন্ত, এবং তিনিই ব্যক্ত ও তিনিই অব্যক্ত গুপ্ত ও প্রকাশিত।[১২] সেরূপ মানুষের আত্মা বাতেন, মানবদেহ আত্মার বহিঃপ্রকাশ—জাহের। পরমাত্মা ও মানবাত্মার এবং সৃষ্টি ও মানবদেহের সাদৃশ্য আছে বলেই আত্মা ও পরমাত্মার মিলন সম্ভবপর। হযরত রাসূলে করীম (সাঃ) বলেন: কুল্লু শায়য়িন ইয়ারজেউ ইলা আসলিহি—প্রত্যেক বস্তুই তার মৌল সত্তায় ফিরে যায়। কুরআন বলে: ইন্নালিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলায়হে রাজেউন---আমাদের সকলের

আগমন আল্লাহর থেকে আল্লাহরই জন্য, এবং তারই দিকে, তাঁকেই প্রত্যাবৃত্ত হতে হবে। এ প্রত্যাবর্তন স্বীয় উৎস বা আসলের দিকেই প্রত্যাবর্তন।

আল্লাহ থেকে যে নূরে মুহম্মদীর প্রকাশ সে নূরে মুহম্মদীরই প্রকাশ সৃষ্টির সর্বত্র। হযরত মুহম্মদ (সাঃ) এ নূরুল্লাহে, নূরে মুহম্মদী রূপে বিশেষ বিকাশ লাভ করেছিল বলে বিশ্বের আদর্শ এবং শেষ পয়গম্বর হতে পেরেছিলেন। এ-নূরে মুহম্মদীই আউলিয়া আবদালের মধ্যেও বিকাশ লাভ করে। তাই তাদের মধ্যেও কারো কারো আল্লাহর দীদার বা তাঁর সঙ্গে সাক্ষাতের ও মিলনের সৌভাগ্য লাভ হয়। কিন্তু কেবল-মাত্র সাক্ষাৎ লাভ বা মিলনেই তিনি আল্লাহ্ হয়ে যান না, বরং তিনি আল্লাহতে বিলীন হওয়ার আনন্দে বিহ্বল হন। কিন্তু দেহের পার্থক্য এবং মৃত্যুর পরেও অবয়ব বা অস্তিত্বের পার্থক্য (seperate entity) একেবারে ঘুচবার নয়। তার ধারণা হতে পারে যে, সে একটি ক্ষুদ্র অগ্নিশিখা, এক বিরাট অগ্নিকুণ্ডে নিপতিত হলো। তাতে পরিণামে সে-ই অগ্নিকুণ্ডে পরিণত হলো। কিন্তু তার 'জ্ঞান ও গুণ', 'জাত ও সিফাত' কখনোই অনুরূপ বিরাট বা পূর্ণ হতে পারে না। বিরাটের যে স্তরে সে একীভূত হলো সে গণ্ডি অতিক্রম করা সহজসাধ্য নয়। যদি বা যুক্তির খাতিরে মেনে নেওয়াও যায় যে, তা হয়ত সাধ্যের অতীত নয়। কিন্তু বিরাটের সর্বত্র, সব রহস্যের অন্তঃপ্রদেশে সে ছড়িয়ে পড়তে, পৌঁছে যেতে পারে কিনা, তা আদৌ সম্ভবপর কিনা সে সম্বন্ধে যথেষ্ট সন্দেহের অবকাশ আছে। মিলনের অবস্থা একটা আত্মহারা আত্মলয়ের অবস্থা। সূফীদের পরিভাষা একে 'ফানা ফিল্লাহ' বা আল্লাহতে আত্মলীন হওয়া এবং 'বাকা বিল্লাহ' বা আল্লাহর মধ্যে অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখা অর্থাৎ তাঁর অস্তিত্বে নিজের অস্তিত্ব লোপ করা, বলা যায়। এ এক অভূতপূর্ব অবস্থা। কিন্তু তাকে তো ভৌতিক দেহের চেতন লোকে বা জাগতিক কার্যকলাপে ফিরে আসতে হয়, তাই তাকে বিচ্ছেদ অনুভব করতে হয়। অথচ তাও যে বিরাটের অন্তের ক্বচিৎ বিভাব স্বভাব; প্রকৃতি, গুণ, জ্ঞান ও শক্তিলাভে পরিপুষ্ট সে সম্বন্ধে কোন সন্দেহ নেই। কিন্তু তাই বলে তা কোনক্রমে গীতায় ব্যাখ্যাত বিরাট বা অসীমের অবতার বা যুগে যুগে জন্মলাভ নয়।[১৩] তাই তাঁর পক্ষে কারো পিতা হওয়া বা পুত্র হওয়ার প্রক্রিয়ার মাধ্যমে পরিবর্তন সিদ্ধ নয়।

তিনি সসীম মানবীয় কার্যকলাপের বাইরে অসীম। সসীম অসীম থেকে কিঞ্চিৎ জ্ঞান, গুণ, সান্নিধ্য, শক্তিলাভে সমর্থ। বৌদ্ধের নির্বাণ বা শূন্যবাদও এ-সত্যের আলোকে শূন্যেই মিলিয়ে যায়। ইসলাম এভাবে প্রাচীন ও আধুনিক সব ধর্মের গোঁড়ামি, গোজামিল ও অস্পষ্ট-তাই দূরীভূত করেছে। হযরত রাসূলে করীম (সাঃ)-এর আগে নূরে মুহম্মদী এবং তাঁর জ্ঞানের, মারিফাতের এরূপ চরম বিকাশ লাভ ঘটেনি বলে ধর্মে অপূর্ণতা ছিল, অস্পষ্টতা ছিল এবং সর্বযুগে সর্ব-দেশে এ-অস্পষ্ট বিকাশই ধর্মকে পূর্ণতা থেকে বঞ্চিত রেখেছিল। ইসলাম নানা প্রদীপের মিটিমিটি আলোর প্রভাকে আলো আঁধারের ভাব-জগৎকে এক নিমেষে সূর্যোদয়ের মত স্পষ্ট, সুষ্ঠু ও সর্বাঙ্গসুন্দর উজ্জ্বল করে তুলল।

কুরআন বলেছে: 'ফিৎরাতুল্লাহিল্লাতি ফাতারান্নাসা সালাইহা'—আল্লাহ তয়ালার প্রকৃতিই সে প্রকৃতি যা দিয়ে মানব প্রকৃতি সৃষ্টি করা হয়েছে। হযরত মুহম্মদ (সাঃ) বলেছেন: "তাখাল্লাকু বিআখলাকি-ল্লাহে'—আল্লাহর গুণে বিভূষিত হও। সুতরাং ইসলামী তাসাউওফ হিন্দু দর্শনের নানা মুনীর নানা মত নয়, এবং তা কোন ধর্মশাস্ত্র থেকে ধার করা হয়েছে বললেও সত্যের অপলাপ হবে। অথবা এ ধারণা হযরত মুহম্মদ (সাঃ)-এর পর প্রক্ষিপ্ত বা অনুপ্রবিষ্ট হয়নি। হযরত নিজেই ঘোষণা করেছেন: 'মান আরাফা নাফসাহু ফাকাদ আরফা রাব্বাহু'—যে নিজেকে চিনেছে, সে তার প্রভুকে চিনেছে। এতেই বুঝা যায় যে, হিন্দু দর্শন ও তাতে বিবৃত পুরুষ-প্রকৃতি, সো অহং, অহংব্রহ্মাস্মি এসব মতবাদ এবং ইসলাম দর্শন, আল্লাহ, নূরে মুহম্মদী, 'আনাল হক'[১৪] মতবাদ এক নয়। তুলনায় আল্লাহ ও বান্দার সম্পর্ক, রাসূল ও নূরে মুহম্মদীর সম্পর্ক, খালেক ও মখলুকের সম্পর্ক এবং এর যৌক্তিকতা অত্যন্ত স্পষ্ট। অবশ্য 'মোতাজিলা', 'আল আশ আরিয়া' ও 'বাতেনিয়া' প্রভৃতি মুসলিম স্বাধীন চিন্তাবিদদের মতবাদের সূক্ষ্ম তাকিকতায় আমরা প্রবেশ করছি না।

এতে পরিষ্কার বোঝা যায় যে, ধর্মীয় ধারণায় 'পুরুষ ও প্রকৃতি' সম্বন্ধীয় ভাবধারা ক্রমে পুষ্ট এবং আবর্জনা ও প্রক্ষেপ রহিত হয়ে পৃথিবীর শেষ ধর্ম ইসলামে এসে পূর্ণাঙ্গ ও সর্বাঙ্গসুন্দর রূপ লাভ করেছে। প্রকৃতপ্রস্তাবে পৃথিবীর সর্বকালের সর্বধর্মের সমন্বিত নির্যাস

ইসলামে এসে রূপ পরিগ্রহ করেছে। বিশিষ্ট অদ্বৈতবাদ, গীতা ইত্যাদির মতের সঙ্গে কিঞ্চিৎ মিল দেখা যায় বলেই ইসলামী তাসাউওফে এ-ধারণাকে বিশিষ্ট অদ্বৈতবাদ বা গীতার অনুকরণ মনে করা ভুল হবে।

রাসূল হযরত মুহম্মদ (সাঃ) শেষনবী। তাঁর পরেও মহাপুরুষের আবির্ভাব হয়নি, এমন নয়। কিন্তু তাঁদের আধ্যাত্মিক উন্নতি হযরতের সমান হতে পারেনি। তা কেউ দাবীও করেনি। প্রাচীন ধর্মমতসমূহে যেমন, খৃষ্টান, ইয়াহুদী, বৌদ্ধ এসব ধর্ম-ধারণায়ও তৎকালীন সম্পূর্ণতা ছিল। কিন্তু কালের গতিতে বিশ্বের সবকিছুকে নিয়ে যতদিন কেয়ামত না হয়, ততদিনের জন্য সবদেশের ও সবকালের মতামত মানুষের উন্নতি, অবনতি ও স্বাভাবিকজীবন যাপন সম্বন্ধে ইসলামের নির্দেশ এমন পর্যায়ে পৌঁছেছে যে, তাকে অনায়াসে সম্পূর্ণাঙ্গ জীবনপদ্ধতি বলা চলে। 'দ্বীন' মানে যদি জীবনপদ্ধতিই হয়, সত্যিকার জীবনপ্রণালী হয়, তবে সে জীবনপদ্ধতির চরম বিকাশ পরিব্যাপ্তি ও প্রসার ইসলাম এনে দিয়েছে। মানবতার স্বাভাবিক পরিশীলন, পরিবর্ধন প্রাকৃতিক নিয়ম হক্কুল্লাহর পরিপোষক নির্দেশ ইসলামী বিধানে রয়েছে। এজন্যই আল কুরআনে অন্যান্য ধর্ম বিধানের স্বীকৃতি রয়েছে এবং পরিশেষে বলা হয়েছে: 'আলাইয়াওমা আকমালতু লাকুম দীনাকুম ওয়া আতমামতু আলায়কুম নেয়ামতী ওয়ারাদিইতু লাকুমুল ইসলামা দীনা।'—আজ তোমাদের জন্য তোমাদের ধর্মকে—জীবন বিধানকে পরিপূর্ণ করে দিলাম, তোমাদের উপর আমার নেয়ামত সম্পূর্ণ করে দিলাম; আর ইসলামকে তোমাদের জন্য ধর্ম বা জীবনবিধানরূপে মনোনীত করলাম।

প্রাচীন ধর্মমতসমূহেও জীবনের সমাধান রয়েছে। কিন্তু তা বিশুদ্ধ চরম বা Perfect নয়। কৃষ্ণ, বুদ্ধ, ঈসা (আঃ), মুসা (আঃ) এঁদের পরে এঁদের সমগ্র গুণাবলীর সমন্বয়ে হযরত মুহম্মদ (সাঃ) এর জন্ম। হযরত অবুবকর (রাঃ), হযরত ওমর (রাঃ), হযরত ওসমান (রাঃ), হযরত আলী (রাঃ) এবং পরবর্তীকালে ইমামগণ হযরতের নূর থেকেই আলো পেয়েছেন এবং তাঁরই ব্যাখ্যাত জীবনব্যবস্থার ব্যাখ্যা করেছেন। শংকর, নানক, কবির, আকবর, চৈতন্য, রামমোহন, রামকৃষ্ণ এ-রাতো আরও পরের পরবর্তী ব্যাখ্যাতা মাত্র।

অনেকেই প্রশ্ন করেন হযরত মুহম্মদ (সাঃ)-এর পরে আর নবী বা রাসূল কি আর আসবেই না? তবে মানুষ ধর্ম তথা যুগোপযোগী জীবন

বিধান লাভ করবে কি করে? এক একজন নবীর যে প্রভাব, ধর্ম-জীবন গঠনের পক্ষে যার একান্ত প্রয়োজন, তা কি করে সম্ভব হবে? প্রকৃত প্রস্তাবে ইসলামই প্রকৃত শেষ ধর্ম বা জীবনবিধান, যার পরে যুগোপযোগী জীবনবিধান সংস্কারের প্রয়োজন হলেও নবী বা রাসূলের আগমন প্রয়োজন হবে না।

বস্তুতঃ ইসলাম কোন নতুন ধর্মমত নয় এবং হযরত মুহম্মদ (সাঃ) তা প্রবর্তনও করেন নি। তিনি মানুষের জানা ইতিহাসের সমস্ত বিধান একত্রিত করে সমসাময়িক কালীন মানবসমাজের জন্য প্রয়োজনীয় সংস্কার করেছেন মাত্র। তিনি নিজেই স্বীকার করেছেন যে, তিনি মিল্লাতে ইবরাহীমের অনুসারী। তাই তাঁকে 'ধর্মপ্রবর্তক' না বলে 'ধর্মসংস্কারক' বলাই সমীচীন বলে মনে করি।

ইসলামের দু'টো দিক বা ভাগ রয়েছেঃ এক. বহিরঙ্গ বা ব্যবহারিক দিক বা শরিয়ত। সর্ব সাধারণোপযোগী তার সংজ্ঞা। অপর, অন্তরঙ্গ বা মারিফাত বিশেষ অনুশীলনী নির্ভর বিশেষোপযোগী তার সূত্র। সাধারণ পন্থায় সম্যক শান্তি লাভ আত্মোৎকর্ষ এবং আত্মোৎসর্গ সম্ভবপর নয় বলেই মারিফাত বা বিশেষ পন্থার প্রয়োজনীয়তা। এ বিশেষ পথে ক্রমবিকাশ কয়েকটি স্তরের মধ্যস্থতায় সম্ভব, তাই শরিয়তের পরে তরিকত, হকিকত এবং শেষ পর্যায়ে মারিফাত—এভাবে নির্দেশ করা হয়েছে। মারিফাত শব্দের অর্থ জ্ঞান, জানা; যে জানায় বিশ্বকে জেনে নিজের মধ্যে বিশ্বকে পুরে নিজেকে জানার মাধ্যমে পরম জ্ঞানী প্রতিপালক স্রষ্টাকে জানা যায়। এই জ্ঞানই প্রকৃত জ্ঞান এবং সব জ্ঞানের পরিণত রূপ। এ জানাই প্রকৃত জানা বলে সূফীমতে একেই মারিফাত বলা হয়।

অনেকের ধারণা উত্তরকালে সূফীবাদ ইরান থেকে আরবে আমদানী হয়েছে। কিন্তু আমরা দেখিয়েছি কি করে প্রকৃত ইসলাম তথা সূফীবাদ হযরত রসূলুল্লাহ থেকেই বিশ্বে প্রসার লাভ করেছে। প্রকৃতপ্রস্তাবে সূফীবাদের ব্যাখ্যা ও অনুশীলনী হযরতের বহু পরে ইরানের স্বর্ণযুগে তথায় পরিশীলিত হয়েছিল। আর পারস্যসাহিত্য এবং ইরানী সূফী-বাদের প্রভাবে প্রভাবিত ওলি-আউলিয়াদের মাধ্যমে এ-বিশেষ প্রক্রিয়া আমাদের দেশে প্রচারিত হয়। পারস্য সাহিত্যের ভাবধারার শ্রেষ্ঠ সম্পদ এ-সূফীবাদে অভিব্যক্তি লাভ করেছে। ওমর খৈয়াম, ফেরদৌসী, সাদী,

জামী, রূমি—সকলেই এ সত্যের পথিক, সাধক, ভাবুক এবং সূফীবাদের প্রত্যক্ষ অনুশীলনকারী।

এ কথা আগেই বলা হয়েছে যে, ইসলামী মতে সূফী নিজেকে প্রেমিক এবং স্রষ্টাকে প্রেমময় মনে করেন এবং সেভাবে রূপকের ব্যবহারিক স্বরূপে তা অভিব্যক্ত করেন।

ভারতীয় ভাবধারায় ভাগবতের অনুসারী বৈষ্ণব অনুরূপভাবেই ভগবানকে প্রেমময় প্রেমিক এবং নিজেকে প্রেমিকার আসনে বসিয়ে ধ্যান করেন। এ দু'ধারার পার্থক্য বিস্তর। এ পার্থক্য কেবল প্রক্রিয়ার পার্থক্য নয়—বিশ্বাস এবং প্রবণতার পার্থক্যও। শরিয়ত কোরআন হাদিসের জাহেরী শিক্ষা। পাঁচ রকমে শরিয়তকে আলেমগণ ব্যাখ্যা করেছেন : হালাল—বৈধ, হারাম-নিষিদ্ধ, মাহকাম—স্পষ্ট, মোতাশাবিহ্—রূপক, মিছাল—দৃষ্টান্ত। এখানে উল্লেখযোগ্য যে, 'হরফে মোকাতেআত' মানে 'সংকেত-হরফ', যেমন আলিফ-লাম-মিম, ইয়া-সিন ইত্যাদি মোতাশাবেহ থেকে আলাদা নয়।

হালাল এবং হারাম স্পষ্ট আদেশ এবং নিষেধ। সুতরাং এ দু'টো মাহকামেরই অন্তর্গত। আর মিছালও মূলতঃ রূপক সুতরাং মোতাশাবিহ্। কুরআনকে অর্থাৎ কুরআনের হুকুমকে ব্যাখ্যা করার জন্য হাদিসের প্রয়োজন। সুতরাং এ সবই হাদিসের বিষয়বস্তু এবং হাদিসেই এসবের মূল ব্যাখ্যা ব সম্প্রসারণ। অতএব মাহ্কামই শরিয়ত এবং মোতাশাবিহই মারিফাত। মাহকাম বুঝতে কুরআন হাদিসই যথেষ্ট। এলমে জাহের এজমা, কিয়াস, ফিকাহ, উসুল—এসব জানলেই মাহ্কাম বুঝতে অসুবিধা হয় না। কিন্তু মোতাশাবিহ্ অনুরূপ জাহেরি এলেম-কালাম দ্বারা বোঝা যাবে না। সুতরাং মূল প্রতিপাদ্য বুঝতে হলে এবং অনুশীলন করতে হলে রাসূলের গুণ এবং জ্ঞানসম্পন্ন ব্যক্তির ব্যাখ্যা বা আত্মিক প্রভাবের একান্ত প্রয়োজন। রাসূল এবং খলিফাদের দু'টো কাজই করতে হয়েছে আর সে যুগে তার প্রয়োজনও ছিল। এই যুগে যাহেরী এলেম-কালাম বা শরিয়ত বোঝার জন্য অনুরূপ কারও দরকার হয় না। কেননা, কুরআন ও হাদীস লিপিবদ্ধ হয়েছে এবং প্রাচীনকালের অপরাপর ধর্মপুস্তকের মত এদের কোথাও প্রক্ষেপ প্রবেশ লাভ করেনি। হযরত আলী (রাঃ)-এর পর থেকে উভয়বিধ

গুণ সম্পন্ন তেমন কোন লোকের হাতে প্রশাসন ক্ষমতা অর্পণ করা সম্ভবপর হয়নি। তাই যুক্তি সম্মত কারণেই অনুরূপ জ্ঞান-সম্পন্ন মনীষীর অভাবে কেবল শরিয়ৎ-ই একদেশদর্শী শাসক ও অলেমদের পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করেছে।

চার

হযরত মুহম্মদ (সাঃ) যেভাবে ইসলামের ব্যাখ্যা করে গেছেন, তাঁর পরবর্তীকালে আজ প্রায় সাড়ে চৌদ্দ'শ বছর যাবৎ তা মানবজাতির সংস্কৃতির ইতিহাসে ব্যবহারিক শক্তি ও আধ্যাত্মিক উন্নতির এক প্রধান উৎস হয়ে আছে। তৌহিদ বা এক আল্লাহ্‌র উপর একনিষ্ঠ বিশ্বাস ও তাঁর হুকুম ও নির্দেশ অনুযায়ী জীবনব্যবস্থার উপর ইসলামের প্রতিষ্ঠা। এ-জীবন ব্যবস্থার মূল উৎস কুরআন। শাণিত তরবারীর মত সংশয়চ্ছেদী সুদৃঢ় ঈমান, আত্মবিশ্বাস, সর্বশক্তিমান করুণাময় আল্লাহ্‌ ও তাঁর নিয়ন্ত্রণে বিশ্বাস এবং নির্ভরতা এর শিক্ষা। ইহ-পরকালে বিশ্বাস, হাশরে ও বিচারে বিশ্বাস, ঐহিক ও পারত্রিক বিশ্বাস এবং জীবনকে ভালবেসে আত্ম-মর্যাদায় বলীয়ান হয়ে অমর জীবনের অধিকারী হওয়ার দৃঢ় প্রত্যয়ের এক অমোঘ বাণী এ কুরআন এনে দিয়েছে। মানুষ যে কেবল আল্লাহ্‌র সৃষ্ট বান্দাই নয়, তাঁর প্রিয় বন্ধুও, আল্লাহ্‌র পরেই তাঁর প্রতিনিধিরূপে প্রতিষ্ঠিত তার সত্তা, সে যে সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ, একথা এ যাবৎ আর কোন ধর্মবিধানে এমনি ভাবে ব্যাখ্যা করতে, কিংবা মানুষের মর্যাদাকে এতখানি উর্ধ্বে তুলে ধরতে পারেনি। এখানেই এর বিশ্বজনীনতা ও সার্বজনীনতা প্রতিষ্ঠিত। হযরতের জীবনী, উপদেশ ও অনুভূতির অনুসরণ ও তার বিকাশই কুরআন প্রচারিত ধর্মের আধ্যাত্মিক ও বাহ্যিক আদর্শ। বিচ্ছিন্ন বিক্ষিপ্ত আদর্শহীন গোটা মানবজাতিকে এই মানবতার ধর্মে দীক্ষিত করে, একই প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ করে উশৃঙ্খল ও অমানুষিক অন্ধকার জীবন থেকে সুন্দর-সুষ্ঠু আলোকোজ্জ্বল জীবনের সন্ধান প্রদান এ ইসলামের প্রবলতম মানসিক প্রেরণার আদর্শ। এক আল্লাহ্‌র প্রতি অবিচল বিশ্বাসের বলে হযরত রসূলে করীম (সাঃ) ছিলেন বলীয়ান। এবং আন্তরিক সত্য প্রেরণা ও মানসিক বলের দ্বারাই দুর্ধর্ষ বেদুঈন আরব জাতিকে বশীভূত, অনুরাগী ও ভক্ত করে নিতে সমর্থ হয়েছিলেন। প্রধানতঃ আরবজাতির সমাজের

পরিধির মধ্যে মানুষের কর্তব্য নিয়ে ব্যাপৃত ছিলেন বলে এবং বিদ্যা-বিচারহীনতার আবহাওয়ায় বেড়েছেন বলে কুরআনের বাণীর হুবহু ব্যাখ্যায় তাঁর বাণী ও কর্মে গভীর আধ্যাত্মিক দৃষ্টি ও পারমার্থিক সত্যের উপলব্ধির পরিচয় ফুটে উঠেছে।

এ-বিশ্বের কোন কিছুই স্থিতিশীল নয়, সব কিছুই গতিশীল। সব ব্যাপারের মতো ইসলামের মধ্যেও একটা গতি বা ক্রম সংঘাত, সংস্রব ও মিলনের ফলে নতুন নতুন ভাবধারা এসে ইসলামে অনুপ্রবেশ লাভ করল। এ-সব ভাবধারার গ্রহণ ও বর্জনের ফলে ইসলামের আরবীয় অনুষ্ঠানাদির মধ্যে পরিবর্তনের সূচনা হলো। তাতে করে এক দিকে ধর্মীয় ব্যাখ্যা যেমন সমৃদ্ধি লাভ করল তেমনি একদল লোকের কাছে নব নব ভাব বেদায়াত বা অভিনব বলে মনে হল। প্রাচীনপন্থী শরীয়ত সর্বস্ব আলেমগণ এ বেদায়াতকে সুনজরে দেখতে পারলেন না এবং ধর্মের ব্যাপারে এ-ধরনের মিশ্রণ ও নবীন মত এবং নবীন ব্যাখ্যার বিরোধিতা করতেও পিছপা হলেন না। তাঁদের মতে ইসলামের পরবর্তী সংস্করণে এসব মত বিভ্রান্তির স্তরে নিয়ে যাবে এবং ইসলামের শুচিতা রক্ষণ ও শরীয়তের মৌলত্ব থেকে দূরে সরিয়ে নিয়ে যেতে পারে—এ আশঙ্কায় তাঁরা উৎকণ্ঠিত হয়ে পড়লেন। তারই ফলে ইসলামের সঙ্গে ইরানী, সিরীয়, বিজান্তীয়, গ্রীক, মিশরীয় প্রভৃতি জাতির সঙ্গে যখন প্রথম সংঘর্ষ ও সংঘাত ঘটলো এবং পরবর্তীকালে রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক, মানসিক, ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক ব্যাপারে যখন পরস্পর বোঝাপড়া আরম্ভ হলো, যার ফলে জীবনের অন্যান্য ক্ষেত্রের মতো ধর্মের ক্ষেত্রেও নানা দৃষ্টিভঙ্গি ও মতবাদের আত্মপ্রকাশ ঘটলো তখন শরীয়ত-পন্থী প্রাচীন ও 'গোঁড়া' সম্প্রদায় এসব অভিনব মিশ্রিত ভাবধারার আচার ও অনুষ্ঠানাদির বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ালেন। এতে অনেক সময় বিচারনিষ্ঠার চাইতে আচার-নিষ্ঠাই যে প্রাধান্য পেয়েছে, এতে কোন সন্দেহ নেই।

এ সব নতুন ধারণা ও মতবাদের বিচারে সূফীবাদ সম্বন্ধে মতানৈক্যের অবকাশ ঘটল। প্রকৃত সূফীবাদ যদিও হযরত রাসূলে করীম (সাঃ) থেকেই আরম্ভ হয়েছিল, সে সাধনার মূল যদিও তাঁর জীবিত কালেই শিকড় মেলে গোড়া শক্ত করে নিয়েছিল, তবু এ ধারার সাধনায় যখন বিভিন্ন দেশীয় নানা উপাদান এসে মিশ্রিত হলো এবং সাধকদের

অনুভূতি, দর্শন, দৃষ্টিভঙ্গি ও আচরণে ক্রমে শরীয়তবহির্ভূত আচার প্রক্ষিপ্ত হলো তখন তা অনেকেই মনেপ্রাণে গ্রহণ করল, আবার অনেকেরই তা গ্রহণ করার স্থৈর্য রইল না। একে ইসলামের স্বাভাবিক বিকাশ, শ্রীবৃদ্ধি, গতি ও পরিণতির শুভ ফল বলে অনেকেই গ্রহণ করতে পারল না। আপাতঃদৃষ্টিতে এ নতুন ভাবধারায়-চিন্তায়-ধ্যানে-আচার-আচরণে যখন শরীয়ত প্রদর্শিত বিচারবুদ্ধি অপেক্ষা কল্পনা ও ভাবুকতার জটিলতা ও বিচিত্র বিকাশ প্রকট হয়ে উঠল, তখন শরীয়তপন্থীদের পক্ষে তা আরো অগ্রহণযোগ্য মনে হলো।

সূফীদর্শন ও চেতনায় পরোক্ষ এবং প্রত্যক্ষে গ্রীক, ইরানীয়, মিশরীয় এমন কি ভারতীয় চিন্তা ও দার্শনিকতার প্রভাব একে কঠোর শরীয়তপন্থা থেকে সরিয়ে অনেকখানি দূরে দুর্বোধ্য অথচ সহজ মারিফাত পন্থায় নিয়ে এসেছিল। সহজ, সরল ও ঋজুবুদ্ধি মানুষের পক্ষে, কর্মী ও বাস্তবপন্থী মানুষের পক্ষে সরল সহজ পথের নির্দেশ গ্রহণের ভাগ্য এবং ধর্মভীরু কর্তব্যপরায়ণ জনহিতৈষী ও আচারনিষ্ঠ সৎলোক তৈরী হওয়ার জন্য শরীয়ত এক অতি উত্তমপন্থা, সন্দেহ নাই। কিন্তু এর মধ্যে চিত্তকে অন্তর্মুখী করার, আত্মাকে অনুভূতির রঙ্গে অনুরঞ্জিত করার ও ভাবনার রসে অনুসিঞ্চিত করার কোন বিধান রয়েছে বলেও আপাতঃদৃষ্টিতে চোখে পড়ে না। হযরত মুসা (আঃ) ও হযরত ঈসা (আঃ)-এর প্রচারিত ধর্মেও অনুরূপ ব্যবস্থা পরিলক্ষিত হয়। তৌওরাত বা Old Testament, ধর্মশাস্ত্র থোরাহ, মুসার পাঁচ কিতাব, ঐতিহাসিক ও ভাববিদদের রচিত একুশখানি গ্রন্থ নেভীইস, প্রার্থনা স্তোত্র উপাখ্যান ইতিহাস ও ভবিষ্যদ্বানী কেথুভিন এসবের সমন্বিত রূপ। তৌওরাত ও তৌওরাতপন্থীদের ব্যবহার এবং তামলুদগ্রন্থ বা তৌওরাত-ব্যাখ্যাশাস্ত্র ইত্যাদিতে বিধৃত জীবনধারা ও ইঞ্জিল বা New Testament-এ বিধৃত জীবনব্যবস্থায় বেশ পার্থক্য থাকা সত্ত্বেও ইসলাম এ দু'ধারাকে অস্বীকার করল না। বরং এ গুলোকেও 'কিতাব' বা ঐশীগ্রন্থ বলে গ্রহণ করে ইয়াহূদি ও খ্রীস্টানদের জীবনপদ্ধতিকে সংশোধিত করে গ্রহণ করে তার নবতর রূপদান করতে চেষ্টা করল। এ দুটো গ্রন্থেই বিধৃত জীবনপদ্ধতি কঠোর বহিরাচরণে সীমিত। ইসলাম এ-সীমাকে অনেক শিথিল করে প্রসারিত ও উদার করে দিয়ে জীবনে নবরূপায়ণের প্রয়াস পেল। তবে মূলতঃ ওয়াহদানিয়াৎ বা এক আল্লাহ্‌রই স্বীকৃতি ও ইবাদত এসব জীবনপদ্ধতির মূল

বিশ্বাস থাকা সত্ত্বেও পরবর্তীকালে এর মধ্যে প্রক্ষেপ প্রবেশের সুযোগ পায়। তারই ফলে, সংস্কারের প্রয়োজন হয়ে পড়ে। ইসলাম সব পরিবর্তন ও সংস্করণরহিত করে দিল। আর নতুন কোন ধর্মবিধানের প্রয়োজন রইল না।

তাই নতুন ভাবধারা বাহ্যিক আচার ও নবতর রূপে ইসলামভিত্তিক বিশ্বাসে সূফী মতবাদের অনুপ্রবেশকে শরীয়তপন্থী মুসলিম সুনজরে দেখতে পারেননি। তাঁদের কারো কারো মতে, ইসলামী প্রগতির অর্থ নতুন ভাবধারা গ্রহণ নয়। তাই যখন অন্তরঙ্গ ও গভীর আল্লাহপ্রীতি সৃষ্টি ও স্রষ্টার অভেদত্ব ও সঙ্গে সঙ্গে পরমাত্মার সঙ্গে জীবাত্মা বা আল্লাহ্‌র সঙ্গে বান্দার প্রেমের সম্বন্ধ; আল্লাহ্‌কে প্রেমিকা ও মানবাত্মাকে প্রেমিক বা প্রেমাস্পদরূপে বর্ণনা, এরূপ বোধ কাল্পনা-ধ্যান-ধারণা-সাধনা ও আরাধনা নিয়ে যখন ইরানে নবম-দশম শতাব্দীর দিকে সূফী সাধনার চরম বিকাশ ঘটল, ধর্মসাধনার ইতিহাসে এক অভূতপূর্ব বিপ্লবের সৃষ্টি হলো, শরিয়তবাদী তখন তাকে উগ্রতা ও নব-সংযোজন মনে করে অতি-ভাববাদিতা বেশরায়ী ও বিদ'আত বলে আখ্যা দিলেন এবং তথাকথিত শরীয়তহীন সূফীবাদকে বরদাশ্‌ত করতে চাইলেন না। প্রকৃতপ্রস্তাবে এর মূল শিকড় হযরতের কাল থেকে থাকলেও এর প্রসারিত, বিস্তৃত ও কিঞ্চিৎ পরিবর্তিত রূপ ধর্মসাধনার ইতিহাসে এক আলোড়নের সৃষ্টি করল।

আগেই উল্লেখ করেছি, এ মতবাদ গঠনে ও ক্রমবিকাশে নানা জাতির উপাদান আহৃত ও সঞ্চিত হয়ে এতে প্রভাব বিস্তার করেছিল। আরবীয় তথা সেমেটিক বিশ্বাস ও ইসলামী সংস্কারের পরিপ্রেক্ষিতে তার সংস্কৃত ভাবধারা, গ্রীক দার্শনিক আফলাতুন ও তাঁর অনুবর্তী নব্য-প্ল্যাতোনিক দার্শনিকদের ঐশ্বরিক সত্য ও কার্যবিষয়ে চিন্তা ও বিচার, ইরানের জরথুস্ত্রীয়বাদের নিষ্ঠা ও তৎসম্বন্ধে আকাঙ্ক্ষা, সত্যান্বেষণ ও নৈতিক একাগ্রতা, মধ্যযুগের ইরানী সভ্যতার নাগরিকতা, ভাবুকতা, সৌন্দর্যপ্রীতি ও রোমান্সবাদ সবকিছু মিশে এক মনোমুগ্ধকর অন্তরের আবেগময় অতীন্দ্রিয় কল্পলোকের সৃষ্টি করল। ইসলাম-আশ্রিত এ-ভাবাবেগের মধ্যে সূফীদের এ-কল্পলোকের বিকাশ বিশ্বমানবের পক্ষে সাগ্রহে গ্রহণযোগ্য হয়েছিল।

সূফীদর্শন ও অনুভূতির ধারা আরবদের মধ্যে থেকে আরম্ভ হয়ে বিস্তার লাভ করেছিল বলে এর প্রথম দিককার ইতিহাসের খোঁজ আরবীয় সাধকদের মধ্যেই পাওয়া যাবে। বিভিন্ন ভাবধারায় সঞ্জীবিত সূফীমতের দুইজন প্রধান আরবীয় সাধক ইমাম শরফুদ্দিন এবনুল ফরীদ ও মুহীউদ্দিন মোহাম্মদ-বিন-আলী ইবনে আরাবী দ্বাদশ শতকে বর্তমান ছিলেন। কিন্তু এককালে ইরানেই সূফীসাধনার উৎকর্ষ ঘটে। শ্রেষ্ঠ কবি, দার্শনিক, চিন্তাশীল ও দীক্ষাদাতাদের অধিকাংশই ইরানে জন্মগ্রহণ করেন। সেইজন্য অনেকের ধারণা, সূফীবাদ ইরানেরই বিশেষ কর্ম-ধারা—ইসলাম-প্রক্ষিপ্ত ভাবধারা অনুযায়ী সৃষ্ট ভাব-প্রবাহে উজ্জীবিত।

সূফীসাধক আবু ইয়াজিদ বিস্তামী, জুনায়দ বাগদাদী, হুসাইন-বিন-মনসুর আল হাল্লাজ, সূফী কবি ও দার্শনিক আবু সাঈদ ইবন আবী-ল খয়র, আবুল মজদ মজহদ সানাই, ফরীদউদ্দিন আত্তার, জালালউদ্দিন রুমি এবং তাঁর গুরু শামস-ই-তাব্রিজী, দার্শনিক আবু হামিদ মুহাম্মদ আল-গাযযালী, মুহাম্মদ শামসুদ্দিন হাফিজ, নূরুদ্দিন আবদুর রহমান জামী, নিজামী গঞ্জবী, ওমর খৈয়াম, ফেরদৌসী, সাদী এঁরা সকলেই ইরানী ছিলেন।

যা হোক, বাংলা-পাক-ভারত উপমহাদেশে মুসলিম আগমনের সঙ্গে সঙ্গে ইসলামের একটি অন্তরঙ্গ-সাধনার একটি লক্ষণীয় পথ হিসাবে তাসাউফ এদেশেও আসে। সূফী পীর দরবেশরা দেশের নানা স্থানে খানকাহ্ বা আশ্রম তৈরী করে বসবাস করতে থাকেন ও ইসলাম প্রচার করেন। এর ফলে স্বেচ্ছায় বহু হিন্দু ও বৌদ্ধ ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে। এ সুযোগে উপমহাদেশীয় ধর্মীয় চিন্তা ও সাধনার আধ্যাত্মিক জীবনে ও অধ্যাত্ম সাধনার প্রকাশ-ধর্মী কাব্যসাহিত্যেও সূফীবাদ প্রভূত প্রভাব বিস্তার করে। উপ-মহাদেশের মধ্যযুগের ভক্তিমূলক সাধনায়, সমাগীয় বৈরাগী ও সাধুদের চিন্তায় গৌড়ীয় মতের বৈষ্ণব প্রমুখ প্রেমা-শ্রয়ী ধর্ম ও সম্পদায়ে এবং সাহিত্যে সূফী অনুভূতির প্রভাব এবং সূফী সাহিত্যের প্রত্যক্ষ-পরোক্ষ প্রভাব পরবর্তী বাংলা-পাক-ভারতীয় সংস্কৃতির আমূল পরিবর্তনসাধনে সহায়ক হয়েছিল।

হযরত রসূলে করীমের (সাঃ) পরে বেশ কিছুকাল পর্যন্ত রাজ্যজয় ও ইসলাম প্রচারে কেটে গেল। তখন তাঁদের মধ্যে গভীর রহস্য-

ভেদের বা গভীর চিন্তার সূক্ষ্ম বিচারের সময় খুব কম। ইসলামের ব্যবহারিক ও শরীয়তের দিকটিই তখন প্রকট হয়েছিল বেশী। কিন্তু তাই বলে সংসারত্যাগী দু'চারজন আল্লাহ্ভক্ত ভাবুকের যে জন্ম হয়নি তা নয়। প্রথমদিকে এঁরা বান্দা ও স্রষ্টার সম্পর্ক স্থাপন করেছিল প্রভু-ভৃত্যের সম্পর্কের মতো। সূফীমতের প্রেমের সম্বন্ধ আরো অনেক পরের। এঁদের সাধনার প্রধান অঙ্গ ছিল আত্ম-দমন, আত্ম-সংযম, শাস্ত্রানুবর্তিতা, শান্তিপ্রিয়তা, একান্তে বসে সাধনা, জপতপ, আল্লাহর প্রতি ভক্তি ও শ্রদ্ধা নিবেদন এবং ব্যর্থ আচার-নিষ্ঠার বর্জন ইত্যাদি।

এঁদের মধ্যে খ্রীস্টীয় অষ্টম শতকের দ্বিতীয়ার্ধে আবু হাসিম শামী-ই সর্ব প্রথম সূফী নামে অভিহিত হন। পরে এর অর্থ আরও ব্যাপক হয়। 'সূফী' শব্দের অনেকগুলি অর্থ রয়েছে। কিন্তু 'পশম', 'পশমী কাপড়' এবং পরে 'পশমী কাপড়ধারী' ওলী দরবেশ ভাবুক আল্লাহ-প্রেমিককেই বোঝান হয়েছে। শীতাতপ নিবারণ করার জন্য প্রথমে ধারণ করলেও পরবর্তীকালে 'পশমী কাপড়', কম্বল বা আলখাল্লা সূফীদের নিজস্ব আবরণ ও আভরণ হিসাবে গৃহীত হয়েছে। দ্বাদশ শতকের শেষের দিকে লক্ষ্মণ সেনের সভায় যে 'শেক'-এর আগমনের কথার উল্লেখ 'শেক শুভোদয়া' গ্রন্থে দেখা যায়, তিনিও এ ধরনেই সূফী ছিলেন। একে 'একাম্বর ধরঃ শূরঃ শিরোবেষ্টন তৎপরঃ' বলা হয়েছে। 'সূফীবাদ' বা 'সূফী-ইজম'কে আরবী ভাষায় 'তাসাওউফ' বলা হয়। 'তাসাওউফ' শব্দটিও 'সূফ', 'সওফ' বা 'সূফী' শব্দ থেকেই গঠিত। এ থেকে দিব্যজ্ঞান, দিব্যানুভূতি, আল্লাহ্তত্ত্ব এসব অর্থেও শব্দটি ব্যবহৃত হয়। এখন এটি একটি পারিভাষিক শব্দ, যার অর্থ অধ্যাত্ম সাধনা বা মা'রিফাত অনুশীলনী। যাঁরা এ-সাধনায় ব্রতী অধ্যাত্মমার্গের সাধক, তাঁরাই সূফী।

ইসলামের প্রথম পর্যায়ে খ্রীস্টীয় নবম শতকের মধ্যভাগ পর্যন্ত প্রায় চৌদ্দ পনের জন সূফী সাধকের সাক্ষাৎ পাওয়া যায়। এ সময়েই তাপসী রাবেয়া জীবিত ছিলেন। তিনি নবম শতকের প্রারম্ভে দেহত্যাগ করেন। ফলাফল বা বেহেশত দোজখ নিরপেক্ষ প্রতিপালক প্রভুতে অনুরক্তিই এ-সাধনার মূলকথা। এ সময়েই কয়েকজন ইরানী সূফীর আবির্ভাব ঘটে। তখন থেকেই সূফী সাধনায় ইরানীদেরও আবির্ভাব ও প্রতিষ্ঠা শুরু হয়।

সূফী মতবাদের দ্বিতীয় যুগের আরম্ভ হয় খ্রীষ্টীয় নবম শতকের শেষ অর্ধেক থেকে দশম শতকের প্রথম অর্ধেক পর্যন্ত। এ সময়ে আবু ইয়াজিদ বিস্তামী ও জুনায়দ বাগদাদী নামক দু'জন ইরানী সূফী ইমামের অনুভূতিতে ও শিক্ষায় সর্ব প্রথম সর্বভূতে আল্লাহ্‌র অধিষ্ঠান 'অহং ব্রহ্মাস্মি' বাদের প্রকাশ্য প্রতিষ্ঠা হয়। ইসলামী আধ্যাত্মিকতার ক্ষেত্রে সূফীবাদের সাধনায় এই প্রথম 'আনাল হক' বা 'আমি সত্য' প্রকাশ্যে ব্যবহৃত হতে থাকে। এ-মহাবাক্য পরে হুসাইন-বিন-মনসুর আল-হাল্লাজের মুখে প্রচারিত হয়ে শরীয়তপন্থীদের বিরাগের কারণ হয়ে দাঁড়ায় এবং এজন্য মনসুর আল-হাল্লাজের প্রাণ দণ্ডাদেশ হয়। আল্লাহ্‌র নিরানব্বইটি নামের মধ্যে 'হক' অন্যতম। ইরানের দার্শনিক ও সূফীদের কাছে এ 'হক' নাম আল্লাহ্‌ নামের প্রতিস্পর্ধী হয়ে ওঠে।

'হক' মানে সত্য; আমি সত্য ও আমার আত্মা সত্য, আমার মূল নূরে মুহম্মদী সত্য; আল্লাহ্‌ সত্য। সত্য ছাড়া মিথ্যা নাই। এ ধারণা থেকেই 'সত্য' শব্দটি 'খোদা' শব্দের বিকল্প হয়ে দাঁড়ায়। ফারসীতে 'খোদা'—খোদ (স্বয়ং)+আ=আমাদ (এসেছেন); অর্থাৎ যিনি নিজে এসেছেন। সংস্কৃত ভাষায় ভারতীয় শাস্ত্রে একেই 'স্বয়ম্ভূ' বলা হয়েছে।

ইরানী সূফী সাধকদের মধ্যে যে, 'হক' শব্দের অত্যধিক প্রয়োগ লক্ষ্য করা যায়, তার কারণ আছে। স্মরণ রাখতে হবে যে, ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করার আগে ইরানীদের মধ্যে যে জরথুস্ত্রীয় ধর্ম প্রচলিত ছিল তার উৎস দ্বৈতবাদমূলক। দুনিয়ায় নেক ও পাপ, সত্য ও মিথ্যা, 'আহুর মজদা' ও 'আহ্‌রিমান'—এদের দ্বন্দ্ব সব সময়েই লেগে রয়েছে। মানুষের সৃষ্টির উদ্দেশ্য, তার কর্তব্য সজ্ঞানে সত্যের জন্য, নেকের জন্য 'আহুর মজদের' পক্ষ নিয়ে, মিথ্যা ও পাপের বিরুদ্ধে, 'আহরিমানের' বিরুদ্ধে লড়াই করা। 'নেকীবদী'র যুদ্ধে সত্য-মিথ্যার দ্বন্দ্বে মানুষ মাত্রই সত্যের সৈনিক। পরবর্তীকালে ইসলাম এলে তার মধ্যেও এ দ্বৈত ভাবের আবিষ্কার কিছুমাত্র আয়াসসাধ্য কাজ বলে বিবেচিত হয়নি। আল-কুরআনে আল্লাহ্‌র পথের বিরোধীশক্তি ইবলিস বা শয়তান বেশ ক্ষমতার অধিকারী বলে উল্লেখিত হয়েছে। বলা হয়েছে যে, সে আদম-সন্তানের প্রতি অণু-পরমাণুতে বিচরণ ক্ষমতা রাখে। শয়তান চিরকাল মানুষকে বিপথে নিতে চেষ্টা করবে,

কুপথ-বিপথ মনোরম বলে দেখাবে আর মানুষ সজ্ঞানে তার বিরোধিতা করে আল্লাহ্‌র পথে চলতে চেষ্টা করবে। এ-দ্বন্দ্বই জীবন-সংগ্রাম। অতএব ইসলাম আগমনের সঙ্গে সঙ্গে 'আহ্‌র মজদ' ও আল্লাহ্ এবং 'আহ্‌রিমান' ও শয়তান এক না হলেও ধারণার দিক থেকে এ দু'য়ের বিরুদ্ধবাদিতা স্বীকার করে নেয়া হয়েছে। সুতরাং 'আল্লাহ্‌র হক্‌ম' বা সত্যতা 'হক' শব্দে 'বাতিল' বা অনর্থ শব্দের প্রতি বিরোধী ধারণা প্রকট হয়েছে।

প্রথম যুগের সূফীরা কতকগুলো নতুন ধারণা নিয়ে এলেন। বাগদাদের সূফী মারূফ আল-করখী একজন মস্তান বা দিব্যোন্মাদ সাধক পুরুষ ছিলেন। ইনি নবম শতাব্দীর প্রথম দিকে ৮১৫ খ্রীষ্টাব্দে ইন্তেকাল করেন। ইনি ইরানী বংশোদ্ভূত আরবী ভাষাভাষী পণ্ডিত ছিলেন। তিনি তপস্যা ও কৃচ্ছসাধন অপেক্ষা অনুভূতির দিকে বেশী নজর দিয়েছিলেন। তিনি বলতেন, ভক্তিই মুক্তির পথ, কিন্তু তা মানুষের সাধনায় মিলে না, তা আল্লাহ্‌র দান। তিনি যাকে করুণা করেন তাকে দান করেন। উপনিষদেও অনুরূপ বাণী রয়েছে :

নায়মাত্মা প্রবচনে লভ্যো
ন মেধয়া, ন বহুনা শ্রুতেন,
নমে বৈষ বৃণুতে তেন লভ্যস্তস্যেব
আত্মা বিবৃণুতে তনুং স্বাম।

মারুফ প্রথম তাসাওউফ-এর সংজ্ঞা এভাবে নির্ণয় করেন: "আত্‌তাসাওউফু আল আখজুবিল হাকায়িকে ওয়াল আসু মিম্‌মা ফিল আযাদিল খাল্‌কে।"—তাসাওউফ হচ্ছে সত্য বস্তুসমূহের উপলব্ধি, আর সৃষ্ট জীবগণের হাতে যা রয়েছে তা ত্যাগেই অর্থাৎ পার্থিব লোভ মোহ মায়া বর্জনেই এ উপলব্ধির সূচনা। এক কথায়, বিষয় নিঃস্পৃহতার ওপরই তত্ত্বজ্ঞান প্রতিষ্ঠিত। আবু সোলায়মান ইরাকী[১৫] সূফী চিন্তায় মারিফাতের বা অতীন্দ্রিয় জ্ঞানকে, শাস্ত্রাতীত অনুভূতিজাত আধ্যাত্মিক বোধকে একটি প্রধান স্থান দিলেন। এই মারিফাত জ্ঞান গ্রীকদের gnosis-এর কল্পনা থেকে গৃহীত হয়েছে বলে অনেকে মনে করেন ; কিন্তু ইরানী মারিফাতের জ্ঞানে গ্রীকপ্রভাব থাকলেও ইসলাম তা পরিশোধন করে এক শুদ্ধ তত্ত্বজ্ঞানে বিকাশের মাধ্যমে এর স্ফূর্তির ধারাবাহিকতার

উল্লেখ করেছে। এরপর এলেন মিশর দেশের অধিবাসী অবুল ফয়েজ সাওবান বিন ইব্রাহীম জুন্নুন আল-মিশরী।[১৬] ইনি মারিফাতবাদকে মেনে নিয়ে আল্লাহ্‌র সত্তায় বিলীন হয়ে মানুষ যে আনন্দ রসের[১৭] অনুভূতিতে অবগাহন করে তাকেই জীবনে একমাত্র কাম্য বলে প্রচার করেন।

'আনাল হক' মন্ত্রের অন্যতম প্রধান সাধক হুসাইন বিন মনসুর-আল-হাল্লাজ 'আনাল হক তসবিহ্‌প্রকাশ্যে ঘোষণা করার জন্য শরীয়ত-পন্থীদের বিরাগভাজন হন এবং এঁরা মনসুরের এ-দাবীকে খুদা-ই দাবী বলে ইসলামবিরোধী পাপ বলে ঘোষণা করেন। তারপর তাঁকে হত্যা করা হয়। হাল্লাজের দর্শন ও অনুভূতির প্রকাশকে শরীয়তপন্থী কাজী ও মোল্লারা সহ্য করতে পারলেন না বটে, কিন্তু অনুভূতিপ্রবণ ভাবুক সমাজে তিনি জীবনমুক্ত মহাপুরুষের সম্মান পেলেন। হাল্লাজ ইসলাম জগতে এক শ্রেষ্ঠ শহীদের আসনে আসীন হলেন। তিনি অসাধারণ পণ্ডিত ছিলেন। তাঁর ব্যক্তিত্ব ও সাধনার অতুলনীয় প্রভাব পরবর্তী সূফী জগতে সর্বজনস্বীকৃত সত্য বলে গণ্য হলো। আল্লাহ্‌র ভাবে তিনি কতখানি বিভোর হয়েছিলেন তা তাঁর পুত্র ও মুরিদগণ লিখে গেছেন। তাঁকে চাবুক মারা হয়েছে। দুই হাত ও দুই পা কেটে ফেলা হয়েছে। একরাত্রি এ-অবস্থায় তাঁকে ঝুলিয়ে রাখা হয়েছে। তার পরদিন শৃঙ্খলা-বদ্ধ অবস্থায় কারাগার থেকে হত্যার জন্য আনা হয়েছে। তিনি শিষ্যদের সাথে হেসে কথা বলছেন, উপদেশ দিচ্ছেন। এ অবস্থা দেখে একজন শিষ্য জিজ্ঞাসা করলেন: প্রভু তোমার এ অবস্থা কেন? তিনি উত্তরে বললেন: তাঁর রূপের আদর এরূপই, যে তাঁর সঙ্গে মিলন চায়, তাকে এভাবেই তিনি টেনে নেন। তারপর এ শ্লোকটি রচনা করে আবৃত্তি করলেন:

নাদিমী গায়ের মানসুবিন ইলা শায়য়িন মিনাল হয়ফি।
সাকানী মিছলা মা আশরিবু কাফি লিজ্জায় বি বিজ্জয়ফি॥
ফালাম্মা দারাতিল কাসি দায়া বিন তাইওয়াস সাইফি।
কাযিমান আশরিবুয়াহ মায়াতিন্নিনি ফি সাইফি॥

: আমার বন্ধু দয়া-মায়ার সম্পর্কের বাইরে। আমায় তিনি পান করালেন যা তিনি নিজে পান করেন, যেমন মেহমানের (Guest) সঙ্গে মেজবান (Host) করে থাকেন। পান-পাত্র ঘুরে আসার পর, তিনি মাথা কাটার

জন্য চামড়ার 'নাত' ও তরবারী আনিয়ে নিলেন। তাঁর এমনি নিয়ম। তিনি গ্রীষ্মকালে মথনাগের সঙ্গে সুরাপান করেন।

এরপর হাল্লাজ যথারীতি সালাত আদায় করে সঙ্গীদের উপদেশ ও উৎসাহ দিয়ে ধীরে ধীরে মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত হলেন। চাবুক মারার কালেও তিনি 'আহাদ' 'আহাদ'—'এক' 'এক' বলে চীৎকার করেছেন।

মনসুরকে সূফী সাধক মালার মধ্যমণি বলা চলে। তাঁর তিরোধানের পর সূফী মতবাদ, দর্শন ও চিন্তা বিশিষ্ট রূপ পরিগ্রহ করতে থাকে। মনসুর-এর পরবর্তী যুগের mystic বা 'মরমিয়া' কবি ও দার্শনিকগণ ইরাকে, আরবে, সিরিয়ায়, মিশরে, স্পেনে, তুর্কীস্থানে, ইরানে, মধ্য এশিয়ায় ও বাংলা-পাক-ভারতে আরবী ফারসী ও অন্যান্য ভাষায় কাব্য কবিতা ও বিচারপূর্ণগ্রন্থ রচনা করে বিরাট এক সূফী সাহিত্যের সৃষ্টি করেন। ফলে, তাসাওউফের কোমলতা ও ভাবপ্রবণতা বিশ্বমানবের দৃষ্টিতে সুন্দরতর ও শোভনতর করে তুলে ধরা হয়। আল-গাযযালীর মতো দার্শনিকও তাসাওউফের সৌন্দর্য ও বিরোধকে মিটিয়ে দিয়ে ইসলামী বিচার ও যুক্তি-তর্কের অবতারণা করে বিশ্বমানবের হিতার্থে প্রয়োগের পক্ষে যুক্তি দেন। ইবনুল ফরীদ, ইবনুল আরাবী, হাকিম সানাই, মৌলানা জালালুদ্দীন রুমী, শামসুদ্দীন হাফিজ, নূরুদ্দীন জামী—এঁরা সবাই মানুষকে নতুন পথের সন্ধান দিয়েছেন। মানুষের মনের ও আত্মার সমস্ত দ্বার খুলে দিয়ে তাতে জান্নাত বা ফেরদৌসের হাওয়া বইয়েছেন। সমগ্র মানব জাতির জন্য এঁরা ভাবুকতার, সৌন্দর্যের ও আধ্যাত্মিক পরম আনন্দের এক অক্ষয় ও অফুরন্ত ভাণ্ডার খুলে দিয়েছেন। সূফী পণ্ডিতেরা দার্শনিক খুটিনাটির সঙ্গে সূফী অনুভূতি ও উপলব্ধি, কল্পনা এবং কাব্যের প্রসারণ, বিচার-বিশ্লেষণ ও বর্গীকরণ করে 'তাসাওউফ'-এর ধারণাটিকে সাধারণ মানুষের পক্ষে হয়তো একটু জটিল করে তুলেছেন; কিন্তু তাতে ক্ষতি হয় নি। সাধারণ মানুষ মনসুর হাল্লাজের বাণী ও সাধনা ইবনুল ফরীদ, ইবনুল আরাবী, ফরীদউদ্দিন আত্তার, মৌলানা রুমি, হাফিজ ও জামীর ফারসী ও আরবী কবিতা থেকে রস আহরণ করে ভাবে নিমগ্ন হতে পারে। আধ্যাত্মিক চিন্তা ও অনুভূতির ক্ষেত্রে আরব ও পারস্য তথা সমগ্র পৃথিবীর মুসলিমদের এ এক শ্রেষ্ঠ অবদান। বাংলাদেশ-পাক-ভারত, সিরিয়া, ইরাক, আরব ও পারস্যের বহু মনীষী এ-ভাবধারায়

উজ্জীবিত হয়ে আধ্যাত্মিক ভাবধারা ও সাহিত্যের পরিপুষ্টিসাধনে সমর্থ হয়েছেন।

ইরানের অন্যতম শ্রেষ্ঠ সূফী কবি নূরুদ্দীন জামী রচিত সূফীমত সার-সংগ্রহ স্বরূপ 'লাবাইহ্' বা 'রশ্মিরাজি' নামক গ্রন্থ থেকে একটি মোনাজাতের উদ্ধৃতি দিচ্ছি। কবিতাটির আরম্ভ আরবীতে, উপসংহার ফারসীতে। মোনাজাতটি গদ্যে এরূপ দাঁড়ায়:

> হে আল্লাহ্, প্রতিপালক, ক্ষুদ্র বিষয় বাসনা থেকে আমাদের মুক্ত করো। সমস্ত বস্তুর সত্য স্বরূপকে আমাদের দেখাও। আমাদের বিচারচক্ষুর উপরে যে গাফিলতির পর্দা পড়েছে, তা সরিয়ে দাও। প্রত্যেক বস্তু যেমনটি আছে তেমনটি দেখাও। বাতিল বা অসত্যকে আমাদের কাছে সত্যরূপে প্রকাশ করো না। সত্যের সৌন্দর্যের উপর অসত্যের পর্দা ঢেকে দিও না। পরিদৃশ্যমান রূপসমূহকে তোমার সৌন্দর্যের ঔজ্জ্বল্যের প্রতিচ্ছায়া করো। এগুলোকে আবরণে ও দূরত্বের কারণ করোনা। এ সকল মায়াময় কাল্পনিক চিত্রকে আমাদের জ্ঞান ও সত্যদর্শনের আয়ত্তে এনে দাও। এগুলোকে অজ্ঞান অন্ধত্বের আয়ত্তও করোনা। আমাদের অভাব ও প্রয়াস আমাদের দোষেই ঘটে, আমাদের মধ্যে আমাদের ফেলে রেখো না। বরং আমাদের থেকেই আমাদের মুক্তিদাও। আমাদের জানতে দাও।

অন্যতম সূফী সাধিকা রাবেয়ার একটি প্রার্থনা এরূপ:

> প্রভু, যদি বেহেস্তের লোভে তোমার সেবা করে থাকি, তাহলে তা আমার জন্য হারাম করো, যদি দোজখের ভয়ে তোমার সাধনা করে থাকি, তাহলে সে দোজখে পুড়িয়ে মারো। আর যদি শুধু তোমার জন্য, তোমারই সন্তুষ্টির জন্য তোমার আরাধনা করে থাকি ; তবে তোমার দর্শন থেকে বঞ্চিত করোনা।

সূফী সাধনা, ভাবধারা ও দর্শন যুগে যুগে আমাদের চিন্তাধারা, জীবন-পদ্ধতি ও সংস্কৃতি তথা কাব্য-সাহিত্যের প্রেরণা যোগাবে এ সম্বন্ধে সন্দেহ নাই।

তথ্যনির্দেশ

১. Maxmuller, Indian philosophy, London, Page 895
২. আল-কুরআন।
৩. ذات
৪. صفات
৫. ইনিল হুক্‌মু ইল্লা লিল্লাহি।—আল কুরআন . . ।
৬. ওয়া ইযা আরাদা সাইয়াল আইয়াকুলা লাহু কুন ফাইয়াকুন। —আল কুরআন . . ।
৭. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।
৮. Lower self এবং Higher self কথাগুলো পাশ্চাত্য দর্শনের। আমাদের বিবেচনায় এ দুটোও প্রমাদপুর্ণ। কারণ self, self-ই। এর Lower এবং Higher নাই। যা আছে বিধা বা aspect-এর বিভিন্নতা।
৯. শ্রীমদ্ভাগবত. ১০।৩০।২৮।
১০. শ্রীকৃষ্ণকীর্তন, বংশীখণ্ড।
১১. আল-হাদীস।
১২. আল কুরআন · · · ·।
১৩. যুগে যুগে সম্ভবামি—গীতা।
১৪. আনাল হক—আমিই সত্য; অহং ব্রহ্মাস্মি— আমিই ব্রহ্ম; সো অহং—তিনিই আমি, আমিই তিনি।
১৫. ইনি ৮৩০ খ্রীষ্টাব্দে ইন্তিকাল করেন।
১৬. ইনি ৮৬০ খ্রীষ্টাব্দে ইন্তিকাল করেন।
১৭. একে وجد বলে।